বাংলায় ধর্মঘট

অশোক ঘোষ

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ধর্মঘট চূড়ান্ত মাধ্যম। প্রচলিত ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের তো অন্য কোনো বাড়তি শক্তি নাই, সে পারে তার দাবি নিয়ে দেন-দরবার ও সবশেষে কাজ থেকে বিরত থাকা- ধর্মঘট। এই পুস্তকটি পশ্চিম বঙ্গের ধর্মঘট বিষয় হলেও সারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলন উপজীব্য হয়েছে অবধারিত ভাবে।

ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে সংগঠিত শ্রমিকরা বিশাল ভূমিকা রেখেছে তা আমাদের অজানা নয়। এই বইটিতে ভারতের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আলোক ঘোষ লিখেছেন পশ্চিম বঙ্গের ধর্মঘটের ইতিহাস। বাংলা ভাষায় ধর্মঘট নিয়ে রচিত বই সম্ভবত এটিই প্রথম।

সেই প্রয়োজন অনুভব করেই বাংলাদেশের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও অগ্রগণ্য প্রকাশন সংস্থা অঙ্কুর প্রকাশনীর কর্ণধার বন্ধুবর মেসবাহউদ্দীন আহমেদ এই গ্রন্থের বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাধুবাদ যোগ্য।

'বাংলায় ধর্মঘট' গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গেও প্রকাশের ক্ষেত্রে তার উৎসাহ লেখককে প্রভাবিত করেছিল।

দুই বাংলায় অজস্র ধর্মঘট হয়েছে। সঠিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা খুবই কঠিন। অবিভক্ত ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল বাংলা প্রভিন্স থেকে। ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেই ইতিহাস তুলে ধরার একটি সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনের অনুসন্ধিৎসু সংগঠকগণ যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল!

দুই বাংলার শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম দীর্ঘদজীবী হোক!

অশোক ঘোষ

utuc@rediffmail.com

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
ইউ টি ইউ সি দপ্তর
২৪৯, বি বি গাংগুলী স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১২
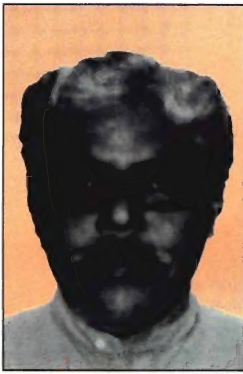
অশোক ঘোষ

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বাংলাদেশে 'বাংলায় ধর্মঘট' গ্রন্থটি প্রকাশ হচ্ছে। মাত্র উনষাট বছরের মধ্যে একটি দেশ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে ও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে- ভেঙ্গে তিনটি দেশে পরিণত হোল। বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ধারা একই সূত্রে গাঁথা। এই দুই দেশেই শ্রমিক আন্দোলনের উৎস, অভিমুখ ও উপাদান সমূহের মধ্যে পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির আত্মত্যাগের অজস্র ঘটনাবলী দুই দেশের গণআন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের দীর্ঘকাল সামরিক শাসনের ফলে শ্রমিক আন্দোলন কিছুটা হলেও ভিন্ন-করনীয় গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দ্বারা। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের ধারা অনুধাবন করতে হলে দুই দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, চড়াই-উৎরাই, উত্থান-পতন-এর ইতিহাস অনুশীলন প্রয়োজন। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রচারী নেতৃত্বের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক

বাংলায় ধর্মঘট

বাংলায় ধর্মঘট

অশোক ঘোষ

গাঙচিল

Banglay Dharmaghat
by Ashok Ghosh

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১৬, গাঙচিল, কলকাতা

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

ISBN : 978-984-91449-9-1

মূল্য: ২৪০.০০ টাকা

ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন

সূচি

ভূমিকা

বিশ্বের যে কোনও দেশের মানুষই ‘ধর্মঘট’ বা ‘স্ট্রাইক’ শব্দটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। মূলত শ্রমজীবী মানুষ দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটকে হাতিয়ার করেন। দাবি-দাওয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নয়, কিন্তু জনসাধারণের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের দাবিতে বা সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট হয়ে থাকে। আবহমানকাল বিভিন্ন রূপে ধর্মঘট হয়েছে। অনশন, অরন্ধন, বয়কট, অবস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ।

আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির জন্ম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, সেই শিল্পবিপ্লব পরস্পরবিরোধী দুটি আধুনিক শ্রেণির জন্ম দেয়। একটি বুর্জোয়াশ্রেণি, অপরটি শ্রমিকশ্রেণি। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পরে উদীয়মান বুর্জোয়োশ্রেণির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে শ্রমিকশ্রেণি জন্ম নেয়, তাদের মন, মানসিকতা, চিন্তা, ভাবনা ও সংগ্রামের কৌশল হয়ে ওঠে বিশেষ ধরনের, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমিকশ্রেণি যে ভাবে আধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে, তাতেই তাদের চরিত্রগত পার্থক্য সূচিত হয়। ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণির দাবি আদায়ের সংগ্রামে ধর্মঘট অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হতে থাকে।

ভারতে আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্প বিপ্লবের কোনও সুযোগ

ঘটেনি। তাই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত ও যন্ত্রণাদায়ক। ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় ধনিক শ্রেণির উদ্ভব। শিল্পশ্রমিক বলতে যে ধরনের চরিত্রের শ্রমিকশ্রেণিকে বোঝানো হয়, প্রাথমিক অবস্থায় তা দেখা দেয় ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লস্টার মিলে। ব্রিটিশ পুঁজিতে আধুনিক শিল্প বিকাশের মধ্য দিয়ে জন্ম হল ভারতের শ্রমিকশ্রেণির। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও উপায়ের উপর যাদের দখল ও মালিকানা তাদেরই বলা হয় ধনিকশ্রেণি। শ্রমিকশ্রেণি ও ধনিকশ্রেণি পরস্পরের দ্বন্দ্ব সমন্বিত সমাজে এই দুই শ্রেণি নিরন্তর নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামকেই বলা হয় শ্রেণিসংগ্রাম এবং শ্রেণিসংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে ধর্মঘটের মাধ্যমে। পুঁজিবাদী ধারায় গড়ে-ওঠা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও মালিকদের পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব এবং ধর্মঘট অনিবার্য। মূলত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও ধর্মঘটের ইতিহাস এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

গত দু'শো বছর পূর্বে বাংলাদেশে প্রথম যে ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল, সেটাই ছিল ভারতে শ্রমজীবী মানুষের প্রথম ধর্মঘট। হয়তো তারও পূর্বে সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষ এই বিশাল দেশের কোথাও না কোথাও ধর্মঘট করে থাকতে পারেন। কিন্তু সে ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। বাংলায় ধর্মঘটের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা দুরূহ কাজ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে তার ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রাম, ধর্মঘট ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিক এবং বস্তুনিষ্ঠ কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইতোপূর্বে বিশেষ রচনা হয়নি। অর্থাৎ এমন কোনও আকর গ্রন্থ নেই যেখানে ধর্মঘটের খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাকবে না এবং শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্যের যথাযথ উল্লেখ থাকবে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রজনীপাম দত্ত বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে তাঁর বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামের উদ্ভবের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

ধর্মঘট ও শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার প্রবণতা গত পঞ্চাশ বছরে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ড. এ আর দেশাই ও আরও কিছু সমাজতত্ত্বের গবেষক শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর আলোকপাত করেছেন। এই বিষয়ে কয়েকটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সে গ্রন্থগুলি সহজলভ্য নয়। স্বাধীন ভারতে সরকারের উচিত ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির উল্লেখযোগ্য ভূমিকার দলিল লিপিবদ্ধ করা। এ বিষয়ে সরকারি বুদ্ধিজীবীরা বহু ক্ষেত্রেই খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করেছেন।

বাংলা ভাষায় 'ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস' সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন বাসুদেব মোশেল। 'ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০—২০০০)' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুকোমল সেন। উপরিউক্ত গ্রন্থ দুটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। অগ্রজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মনোরঞ্জন রায় ও গোপাল ঘোষের গ্রন্থ দুটি কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন। উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি থেকে বেশ কিছু প্রামাণ্য তথ্য এ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, অনশন অরন্ধন হরতাল ধর্মঘট ও বন্ধ ইত্যাদি হাতিয়ার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও শ্রমিক ধর্মঘটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ শোকে ও আবেগে বিহ্বল হয়ে অথবা অন্যায় অবিচারের প্রতি ধিক্কার জানাতে অরন্ধন ও সর্বাত্মক হরতাল বা ধর্মঘট পালন করেছেন। এই ধরনের ধর্মঘটের বিবরণ রাজনৈতিক ও শ্রমিক ধর্মঘটের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বসহ লিপিবদ্ধ হয়নি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণ কারাবরণ ও আত্মত্যাগের অজস্র ঘটনা আছে, ইতিহাসে যার যথাযথ উল্লেখ দেখা যায়নি।

ভারতীয় সমাজজীবনের গত একশো বছরের ইতিহাসে প্রথম যে ঘটনায় জনজীবন ব্যাপক আন্দোলিত হয়েছিল, সেটা ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা। 'রাওলাট আইন'-এর বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভায় নিরস্ত্র জনতার ওপরে গুলি চলে। দু'দিন এই

গণহত্যার ভয়াবহ ঘটনা সমগ্র দেশবাসী জানতে পারে। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আহ্বানের অপেক্ষা না করেই সমগ্র পঞ্জাব সহ সংলগ্ন প্রদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা ও ধিক্কারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক বন্‌ধের মাধ্যমে। সমগ্র দেশেই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল। এই বর্বরোচিত গণহত্যার ঘটনায় ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইটহুড' খেতাব ত্যাগ করেছিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দার্জিলিংয়ে অবস্থানের সময় আকস্মিক জীবনাবসান হয়। সমগ্র বাংলাদেশে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাঁর মরদেহ কলকাতায় নিয়ে আসার পরে ঘরে ঘরে অরন্ধন ও জনজীবন স্তব্ধ হয়ে সর্বাত্মক বন্‌ধে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন সমগ্র দেশ আনন্দে উদ্বেল হয়ে আবেগে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছিল। সেদিনও কার্যত দোকানপাট হাটবাজার অফিস আদালতে কোথাও কোনও কাজ হয়নি। বলা চলে খুশির বন্‌ধ দেখা গিয়েছিল।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী যে দিন গুলিবিদ্ধ হলেন, সে দিন সমগ্র দেশ শোকে ও ধিক্কারে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়। পরের দিন শোকস্তব্ধ দেশে অরন্ধন ও সার্বিক বন্‌ধ হয়েছিল।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশের জন্য সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করেননি। জনসাধারণের ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা ও ধিক্কারের প্রকাশ ঘটেছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন কাশ্মীরের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মরদেহ কলকাতায় আনা হলে অরন্ধন ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছিল।

সম্প্রতি কালে ১৯৮০ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের বাসভবনে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রয়াত হলে সমগ্র দেশেই স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ হয়েছিল। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী জনপ্রিয়তম নেত্রী ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী চেন্নাইতে নিহত হলে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বন্‌ধ হয়েছিল।

জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় এবং দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনেতাদের আকস্মিক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটলে সমগ্র দেশেই তার প্রভাব ও বেদনাবহুল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু যে সকল ঘটনা বা মৃত্যু জাতির

জীবনকে নাড়া দিয়ে যায়, সেই ঘটনাগুলিতে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া প্রায়শই সর্বাত্মক ধর্মঘট বা বন্‌ধে পরিণত হয়। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনাসমূহের আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভব হয়নি।

'বাংলায় ধর্মঘট' আরও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা হতে পারত যদি এই প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কোনও ইতিহাস থাকত। বাংলাদেশে বহু ধর্মঘট হয়েছে যার কোনও লিখিত তথ্য পাওয়া যায় না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে বাংলাদেশে গবেষণার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে কোনও গবেষকই অনুভব করেননি। সে কারণে এই গ্রন্থে বেশ কিছু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে।

সর্বক্ষণের একজন রাজনৈতিক কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকের পক্ষে ইতিহাস ও তথ্যের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থ রচনা স্বভাবতই বিশেষ কঠিন। গাঙচিল-এর কর্ণধার অধীর বিশ্বাস গত দেড় বছর ধরে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়েছেন, ধৈর্য ধরে লেগে থেকেছেন 'বাংলায় ধর্মঘট' প্রকাশের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। তিনি না থাকলে এ-গ্রন্থ প্রকাশ হত না।

এই গ্রন্থ রচনায় বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন আবাল্য সুহৃদ ও রাজনৈতিক সহকর্মী প্রলয় চৌধুরী, পাণ্ডুলিপি ডিটিপি করেছেন স্নেহভাজন অমল দত্ত। আমার রাজনৈতিক সহযোদ্ধা ও আজীবন সঙ্গী শিখা ঘোষ নীরবে আমার সব অত্যাচার সহ্য করেছেন। হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে পুনরায় কপি করেছেন প্রণতি ভৌমিক। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মীরাও সাহায্য করেছেন।

ধর্মঘটের তালিকা প্রণয়নে বন্ধুবর দীপক মিত্রের তথ্যের উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে নির্দিষ্ট গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এই ধরনের একটি গ্রন্থে ভুল-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগী বন্ধুবর্গ সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে উল্লেখ করলে বাধিত হব।

অশোক ঘোষ
utuc@rediffmail.com

ইউটিইউসি দফতর
২৪৯, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১২

২০ জানুয়ারি ২০১৬

সূত্রপাত

মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানবসভ্যতা বিকাশের ধারায় শ্রমের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সম্পর্ক আদিকাল থেকেই বহমান। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ কোনও না কোনও শ্রম বা কাজ বা বৃত্তি অবলম্বন করেছে। পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় শ্রমের পরিধির বিস্তার ঘটেছে। মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। শুধু মানবসভ্যতার ইতিহাস নয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শ্রমজীবী মানুষের অবদান ব্যতিরেকে সম্ভব হতে পারত না।

জীবনের জন্য জীবিকা। মানুষ কোনও দিনই শ্রমবিমুখ ছিল না। প্রাচীন বাংলায় হাজার বছরের পুরনো চর্যাগীতি, বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা-র মধ্যে তৎকালীন সমাজের কর্মময় জীবন তথা জীবিকার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে। জীবিকা হিসাবে মানুষ গ্রহণ করেছে জাতিগত বৃত্তি— তাঁত তৈরি, চাঙারি বোনা, মাছধরা, নৌকো বাওয়া এবং সৃজনশীল সুকুমার শিল্প, নৃত্য-গীত যা এক দিকে বিনোদন, অন্য দিকে বৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। নৌকো পারাপার, গো-চারণ, দুধ-দই বিক্রি, পশু শিকার ও মাংস বিক্রি ইত্যাদি পেশার বহুল পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মরীতির আলোচনা করলে বহু ধরনের শ্রম আর শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস জানা যায়।

শ্রমের ও শ্রমজীবী মানুষের সত্তা কী? অর্থনীতিবিদগণের ব্যাখ্যায় 'শ্রমজীবী' তাদেরই বলা হয়, যারা কেবল কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে। আর শ্রম হল উৎপাদনকার্যে নিয়োজিত মানুষের সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা। এই শ্রম মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার হতে পারে। সে কারণেই শ্রমের সঙ্গে উৎপাদনের একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যে শ্রমে কোনও না কোনও প্রকার উপযোগিতা (ইউটিলিটি) সৃষ্টি হয়, সেটাই উৎপাদনশীল শ্রম। কৃষক-শ্রমিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, শিল্পী, আইনজীবী এই ধরনের বিভিন্ন পেশায় যারা যুক্ত তাদের সকলেরই শ্রম কম-বেশি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সামাজিক অবস্থান মর্যাদার দিক থেকে কৃষক-শ্রমিক ও চিকিৎসক ও আইনজীবী সম পঙ্‌ক্তিতে বা সমমর্যাদার আসনে বসেনি কোনও দিন। আদিকাল থেকেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কৃষক-শ্রমিক সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নিম্ন সারিতে অবস্থান করেছে। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামো পরিচালনায় এদের প্রয়োজন বৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু মান বৃদ্ধি ঘটেনি কোনও দিন। শাসক বদল ঘটেছে বহুবার, আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও ধর্মরীতির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান থেকে গেছে একই স্তরে, ঘটেনি শোষণ, বঞ্চনা ও দারিদ্র-দুর্দশার পরিসমাপ্তি। এই শোষণ বঞ্চনা থেকে রাজধর্ম আশ্রিত শ্রমজীবী মানুষেরা কেউই বাদ পড়েনি।

এ সব সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষ যে কোনও সমাজেই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুসারে অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। একটি বিষয়ে প্রায় সব সমাজবিজ্ঞানী সহমত হয়েছেন যে, জাতি ও ধর্মভিত্তিক মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও শ্রমজীবীরা ছিল স্থানীয় জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের বঞ্চনা আর অত্যাচারের শিকার। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা। সমাজের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হোক এটা সমাজকর্তারা কেউই চাননি। মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ প্রতিহত করার সর্বপ্রকার কৌশল সমাজকর্তারা গ্রহণ করেছিলেন। অন্ধ সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহ পর্যন্ত চলত। ধর্ম, পাপ-পুণ্য, আনুগত্য এবং ভগবান সম্পর্কীয় সেই সব ধারণার প্রচার চালানো হত, যেটা শাসনকর্তাদের শ্রেণিস্বার্থকে রক্ষা করে। এই অত্যাচার কখনও

কখনও চরম আকার ধারণ করত, সীমা ছাড়িয়ে যেত, ফলে সাধারণ দরিদ্র মানুষ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হত। এক শ্রেণির শ্রমজীবী মানুষ এই অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পে জমিদারের অত্যাচারের হতদরিদ্র কৃষক গফুর জোলা রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মর্মস্পর্শী আখ্যান আজও প্রাসঙ্গিক।

মানুষের মধ্যে নারী শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। নারী শুধু গৃহবধূই ছিল না। তারা পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর সহকারিণী ছিল। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-অনভিজাত প্রায় সকল পরিবারের মেয়েরাই পুরুষের সঙ্গে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে অর্থোপার্জনে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করত। অভাব ও দারিদ্রের কারণে নিম্নবৃত্তির মেয়েদের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল বিশেষ অগ্রগণ্য। সমাজের নিম্নশ্রেণিতে অবস্থান থাকার কারণে এদের মধ্যে সামাজিক বিধি-নিষেধও শিথিল ছিল। সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষরা ছিল সৎ, বিশ্বাসভাজন এবং কৃতজ্ঞপরায়ণ। তাদের শ্রমেই সভ্যতা গড়ে উঠেছে, বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে পেয়েছে উপেক্ষা ও বঞ্চনা। নারী শ্রমজীবীদের বঞ্চনা ছিল আরও বেশি। আশ্রয়, নিরাপত্তা ও অন্নবস্ত্রের বিনিময় ছাড়া অন্য কোনও পারিশ্রমিক নারী পুরুষের কাছ থেকে পায় না। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, দেশি রাজশক্তির উত্থান ও বিদেশি রাজশক্তির ক্ষমতা দখলের কারণে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে বার বার। যার ফলে এ দেশে স্থায়ী ও সুস্থ সমাজজীবন গড়ে উঠতে পারেনি। সাধারণ মানুষ পেয়েছে কেবল লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর বঞ্চনা, অবহেলা। মধ্যযুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ কৃষক, শ্রমশিল্পী, কারিগর তথা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও সুস্থ অর্থনৈতিক জীবনযাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এ প্রসঙ্গে ড. অরবিন্দ পোদ্দারের 'মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য— 'বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশেছে সমাজের অভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণিগত বৈষম্য। সুতরাং উৎপীড়ন, সুদ-বাট্টাভোগী মহাজনরা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থানীয় সংহত জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসঙ্গতির চাপে বৃহত্তর

জনসমষ্টির জীবন নানা দিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্ত্যনীয়, শান্তি সুদূর পরাহত।'

দিল্লির সম্রাটদের বিলাসিতার ব্যয়ভার বহনের জন্যই অতিরিক্ত কর আদায় করা হত এবং কর আদায়কারী রাজকর্মচারীদের ছিল নির্মম আচরণ। সে যুগে বিত্তবান মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। বৃহত্তর জনসমাজ শারীরিক শ্রমের দ্বারাই জীবন-জীবিকা প্রতিপালন করত। মূলত এরাই শ্রমজীবী মানুষ নামে পরিচিত। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অন্যায়, অবিচার আর নির্মম শোষণের প্রতিবাদে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, ধর্মঘট, অবস্থান ও আন্দোলনের পথে আপন আপন পদ্ধতিতেই শামিল হয়েছে, কখনও একক ভাবে, কখনও সমবেত ভাবে।

২

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি ছিল মূলত কুটির শিল্পকেন্দ্রিক। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কুটির শিল্পের অর্থনীতি। বৃত্তির সঙ্গে বর্ণব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। বর্ণব্যবস্থা ছিল কঠোর। এই বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাওয়া বা অস্বীকার করা বা বর্ণব্যবস্থা অনুসারে নির্দিষ্ট বংশানুক্রমিক পেশার ব্যতিক্রম ঘটানো সম্ভব ছিল না। নিজেদের দৃঢ়মূল বংশগত বৃত্তিভিত্তিক জাতি-বর্ণভেদ ব্যবস্থার বাইরে যেতে পারেনি। সেই যুগে সমস্ত ভারতবর্ষেই জাতিগত বৃত্তি নির্ভর সমাজ গড়ে উঠেছিল। আর এই পথে জীবন-জীবিকা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তাঁরা একটি ন্যূনতম নিরাপত্তা খুঁজে পেতেন। কুটিরশিল্পের অর্থনীতিই তাদের সারা বছরের নুন-ভাতের জোগান দিত, আর এই কুটিরশিল্পই তাদের অন্য কোনও পেশার দ্বারস্থ হতে দেয়নি। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে গৌরবজনক ভূমিকা ছিল ভারতীয় তাঁত শিল্পের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় তাঁত শিল্পের অসাধারণ চাহিদা ছিল। বিশেষ করে বাংলার তাঁতিদের দ্বারা প্রস্তুত মসলিন। সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ' (১ম খণ্ড, পৃ. ১০২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—'১৬০০ খ্রিস্টাব্দেই ২৪২ লক্ষ টাকার মসলিন রফতানি হয়েছে।' সেকালের কুটির শিল্পের প্রধান উৎপাদন ছিল তাঁতবস্ত্র। তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন যেহেতু

ছিল বংশানুক্রমিক পেশা, অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশে ও করমণ্ডলের গ্রামগুলিতে সব বয়সের লোকজনই তাঁতশিল্পে নিযুক্ত থাকত। কুটিরশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত তাঁতবস্ত্র।

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত পরিবারগুলির জীবন ও জীবিকা প্রতিপালন হয়েছে হস্তচালিত তাঁত শিল্প থেকে। কুটিরশিল্পে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের বাজারমূল্য জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের উপযোগী ছিল। সেকালের কলকাতায় মাসিক ৫-৬ টাকার আয়ের সাধারণ একজন কারিগরের আর্থিক অবস্থা ছিল মোটামুটি। গ্রামাঞ্চলের তাঁতিদের মাসিক আয় আর একটু কম হলেও, জীবিকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও সংকট দেখা দেয়নি। কারণ দেশের অপরিবর্তিত অর্থনীতিতে মূল্যমান বছরের পর বছর অপরিবর্তিত থাকত।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে দেখা যায়, ভারতীয় জনজীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংশাসিত কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে ভিত্তি করে অনমনীয় ও কঠোর অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোতে আবদ্ধ। এই জীবনধারা দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত বলেই এই সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামো সুসংগঠিত ও দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল। সমাজজীবনেও বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন উপলব্ধি করা যেত। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কোথাও সামান্য আঘাত লাগলেও ইংরেজ আগমনের পূর্ব অবধি জীবনযাত্রার কাঠামো অক্ষত ছিল।

ইংরেজ বণিকদের ভারতে আসার পর থেকেই স্থিতিশীল অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ভারতের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প ও কৃষির পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক ইংরেজের নিজস্ব বাণিজ্যিক কারণে হস্তক্ষেপের ফলে ভেঙে পড়ল। দেশীয় অর্থনীতির দীর্ঘকালের ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বিশেষ করে তাঁতশিল্পের উপরে ক্রমাগত আক্রমণের কারণে তাঁতিরা বংশপরম্পরার জাত ব্যবসা থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেল। দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে-থাকা ছোট ছোট তথাকথিত 'অর্ধসভ্য' গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেও বিপর্যস্ত করে দেওয়া হল। ইংরেজ বণিকরা নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থে ভারতের তদানীন্তন অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলেন। যে ভারতবর্ষ এক সময় রফতানিকারক দেশ ছিল, সেই ভারত ইংরেজ শাসনে হয়ে উঠল আমদানিকারক দেশ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শিল্পবাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার পর

ভারতীয়দের বাধ্য করে ইংরেজের বৈষম্যমূলক নীতির ফলশ্রুতিতে দারিদ্রের যে বিস্তার ঘটল, তাকে স্বীকার করে নিতে। ভারতীয় শিল্পগুলি অনিবার্য ধ্বংসের নির্দিষ্ট পরিণতির পথেই এগিয়ে গেল। এক দিকে যেমন ভারতীয় ট্রাডিশনাল শিল্পসমূহের ধ্বংসসাধন ঘটল, অপর দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বাজার একচেটিয়া ভাবে দখল করার ফলে কোম্পানির আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের স্বদেশীয় শিল্পবিপ্লবের পথও মসৃণ হল। উনিশ শতকের প্রথম দিকেই ইংল্যাণ্ডে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বিশাল বাজার তৈরি হয়ে গেল ভারতে। সেই বাজার সম্পর্কে কাল মার্কস লিখেছেন— '১৮২৩ সালে যে বিনিময় হার ছিল সাধারণত টাকায় ২ শি. ৬ পে. তা নেমে গেল ২ শিলিঙে।' প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের খ্যাতি ছিল সুতিবস্ত্রের জন্য। সুতির দ্বারা প্রস্তুত সমস্ত পণ্যেরই বৃহৎ কারখানা ছিল সমগ্র ভারত। এ বার সেই শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে ভারতের বাজার ইংল্যাণ্ডে তৈরি টুইস্ট ও সুতিবস্ত্রে ছেয়ে গেল। ভারতের নিজস্ব উৎপাদনের হয় ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের অধিকার ছিল না, নতুবা কঠোর শর্তে অনুমতি দেওয়া হত। ইংল্যাণ্ডের পণ্যসামগ্রীর মূল বাজার হল ভারতবর্ষ। কার্যত ভারত হয়ে দাঁড়াল ইংল্যাণ্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল রফতানিকারক এবং ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত পণ্যের আমদানিকারক। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই শিল্প-অর্থনীতির চিন্তাভাবনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আর্থিক স্বার্থেই এই পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠল। ভারতকে কাঁচামালের জোগানদার হিসেবে না দেখে তারা সিদ্ধান্ত করল ভারতের কাঁচামালের পণ্য উৎপাদন হবে ভারতেই। ১৮১৮ সালে গৃহীত হল নতুন নীতি। এ দেশেই আধুনিক বস্ত্রশিল্পের প্রথম পদক্ষেপ এক নতুন যুগের সূচনা করল। গড়ে উঠল বাংলাদেশেই 'ফোর্ট গ্লস্টার মিল', যা পরবর্তী কালে বাউড়িয়া কটন মিল নামে পরিচিত। ব্রিটিশ পুঁজিতে গড়ে ওঠা এই কারখানাটি আজও আছে। এই কারখানাটি চালু হয় ১৮১৯ সাল নাগাদ। যন্ত্রশিল্পের উপযোগী শ্রমিক অমিল হওয়ার কারণে ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে বহু মহিলা শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয় কাজ করার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে কাজের পরিপন্থী পরিবেশে তারা বেশি দিন বেঁচে থাকেনি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জাপান ছাড়া ভারত, চিন এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এশিয়ার এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

ও কুটির শিল্পজাত পণ্য ইউরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আমেরিকার মতো এ দেশে তাদের অনুপ্রবেশ নির্বাধ হয়নি। কেননা, এ দেশের সমৃদ্ধিশালী এবং অতি প্রাচীন সংস্কৃতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল—সমাজব্যবস্থা তখনও প্রাক্ ধনতান্ত্রিক অথবা কোথাও কোথাও ধনতন্ত্রের শৈশব চলছিল। তাই পশ্চিমি আগন্তুকরা এখানে আমেরিকার মতো স্থায়ী ভাবে বসবাসের কথা না ভেবে ধন-সম্পদ, পণ্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। লুঠ করে বিপুল সম্পত্তি নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে মূলধনে রূপান্তরিত করেছিল। ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় পলাশির যুদ্ধ থেকে ওয়াটারলুর যুদ্ধ পর্যন্ত কাল। এই সময় ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড থেকে ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১০ ভাগেরও বেশি ইংরেজ আত্মসাৎ করেছে (ড. প্রিয়তোষ মৈত্র, ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা, পৃ. ১০—১২)

৩

ভারতে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মধ্য দিয়েই দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তনের দিক নির্দেশ সূচিত হয়। এক নতুন শ্রেণি জন্মগ্রহণ করে, তারাই হলেন শিল্পশ্রমিক। শ্রমিক শোষণের নব নব হাতিয়ার হয়ে উঠল নতুন নতুন যন্ত্র ও কারখানাগুলি। মুখ্য ও ভূমিহীন কৃষকদের একটা বড় অংশ বহু বছর ধরে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্প শ্রমিকে পরিণত হলেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের শোষণের মধ্য দিয়ে মালিকদের পুঁজিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটল অর্থাৎ শ্রেণিগত ভাবে ভারতে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব হল।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ঢেউ ভারতে এসেও ধাক্কা দিল। রাজা রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার প্রমুখের মতো প্রগতিশীল ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীরার ব্রিটিশ পুঁজির সহায়তায় ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটুক এমনটাই চেয়েছিলেন। এ দেশে শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার বিষয় বহুমুখী পরিকল্পনা এঁরা গ্রহণ করেছিলেন। এ দেশে ইংরেজ যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পন্থা

অবলম্বন করে তার ফলে সে দিনের স্তব্ধ সমাজমানস নতুন করে বিকাশের পথ খুঁজে পেল— রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ছিলে পথিকৃৎ। ভারতে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণিসুলভ গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ভাবধারার আবির্ভাব ১৯ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। এই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে। এঁরা চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে একটি ভারতীয় জাতীয়তার সৃষ্টি করতে।

আর্থ-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সে দিন ভারতের মাটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার কাজ হয়তো বা শাসকদের অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুরু হয়। আর তাই ভারতের সমাজমানসেও ধনতন্ত্রের দর্শন লিবারালিজমের আবির্ভাব ঘটে। এই লিবারালিজম সে দিন প্রধানত জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল।

বিরাট দেশ ভারতবর্ষ— প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের খ্যাতি জগৎময়। সে কারণেই ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় অর্থনীতির স্থায়িত্বকাল ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় দীর্ঘায়িত হল। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকেই সামন্তযুগীয় অর্থনীতির ব্যর্থতা জনজীবনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভারতে সে দিন ইংরেজ আগমনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার অন্ধকার থেকে বহির্বিশ্বের সূর্যালোকের স্পর্শ পেল। এর প্রভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক সংগঠনের স্বনির্ভর কাঠামো, প্রতিবাদহীন গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসনব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র ও অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকৃত এবং অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাভিচারদুষ্ট ভাবধারা সব কিছু ভেঙে পড়তে লাগল। আগের মতো জীবন আর নিশ্চল, নিথর রইল না। ব্রিটিশ শাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিসমাজের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ মানসজগতের সঙ্গে উন্নততর সমাজমানসের সংযোগ ঘটল। এ ভাবেই সামন্তযুগীয় সমাজকাঠামোর ভেতরেই নতুন অর্থনৈতিক শক্তি ও সমাজবিন্যাসের সূচনা হয় এবং জরাজীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। এই ভাঙন শুরু হয়েছিল সময়ের নিয়মেই। স্বাভাবিক ভাবেই, নতুন সমাজ সম্পর্কের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে। কিন্তু

তার পাশাপাশি পুঁজিবাদী বিকাশের কাজ চলল অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে। এই ভাঙা-গড়ার নেতৃত্বে স্বাভাবিক ভাবে থাকা উচিত ছিল দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের। কিন্তু পশ্চাদপদতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল অধিকতর শক্তিশালী বিদেশি বণিক সম্প্রদায়ের হাতে।

ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইংরেজদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ঘটল। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, অবাধ প্রতিযোগিতা, চুক্তি কারবার ও সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকারের স্বীকৃতি অন্যতম শর্ত। বংশগত, জাতিভেদ প্রথা এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদের ওপর প্রাক্ ধনতান্ত্রিক যুগের স্বৈরাচারী ক্ষমতার নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারবোধের জীবনাদর্শ। কাজেই এই নতুন জীবনাদর্শ সামাজিক অগ্রগতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতিবংশ-স্ত্রী-পুরুষভেদ নির্ভর সামাজিক সুযোগসুবিধা ভোগের প্রথার অবসানই সামাজিক অগ্রগতিতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে দিনের শিক্ষিত সমাজমানসে স্বীকৃতি পেল। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিজস্ব নিয়মেই গড়ে উঠল শিল্প, কলকারখানা, বাণিজ্য। পাশাপাশি জন্ম নিল শ্রমজীবী মানুষ যারা উৎপাদন করে। রেলপথ, বৃহদায়তন শিল্প, বাগিচা শিল্প, বাণিজ্যগত কৃষিপণ্য উৎপাদনের মধ্য দিয়ে ভারতে সৃষ্ট ধনতান্ত্রিক পরিবেশ এবং ইংরেজদের বহন করে আনা নতুন জীবনাদর্শ প্রভাবিত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভারতীয় সমাজমানসে জাতীয়তাবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ভাবধারার বিকাশের পথ তৈরি করে দিল। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের এই ধারাই ইতিহাস নির্দেশিত এবং ইতিহাস প্রমাণিত।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর রাজদণ্ড বিদেশিদের শ্রেণিগত স্বার্থে অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতিতে ইংরেজ অর্থনীতির প্রাধান্য স্থাপন করার এবং নিজেদের দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে দেশীয় মানুষদের মনে বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। এই বিক্ষোভই রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধের রূপ নেয়। পরবর্তী কালে এই জাতীয়তাবোধ থেকেই জাতীয় কংগ্রেস জন্মগ্রহণ করে।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে দিন আমাদের দেশে উঠতি বিত্তবান মধ্যবিত্ত ও শিল্পপতিরা দেশে নির্বাধ শিল্পায়নের কাজে পাহাড়প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দেশীয় শিল্পপতিদের শিল্পায়নের প্রচেষ্টা প্রতি

পদে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। বস্ত্রশিল্প থেকে মুনাফা সঞ্চয় করে ভারতের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণি আধুনিক ভারী যন্ত্রপাতির শিল্প গড়ে তুললেন। জামশেদজির 'টাটা আয়রন ওয়ার্কস' তৈরি ভারতে প্রথম ভারী শিল্পের পত্তন— বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। এই শিল্পের পত্তন সম্পর্কে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক হ্যারিস সাহেব তাঁর 'লাইফ অব জে এন টাটা' গ্রন্থে এক প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন:

তখন ভারতে স্বদেশি আন্দোলনের শৈশবকাল। দেশের শিল্প গড়ে তুলতে হবে— ভারতীয়রাই গড়বে ভারতীয় শিল্প— বিদেশি পণ্যকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সেই সময় দোরাবজি টাটা ও পাদশা এই উদ্দেশ্যে মূলধনের আশায় ইংল্যাণ্ডের বাজারে ধর্না দিলেন। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দেশে ফিরে এলেন। স্থির করলেন দেশের শিল্পের পত্তন হবে দেশের মানুষের টাকাতেই। আবেদন করলেন মূলধনের জন্য দেশবাসীর কাছে। হ্যারিস সাহেব লিখেছেন— 'সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত টাটাদের বোম্বাই অফিসে সে কী অসম্ভব ভিড়। দেশবাসী মূলধন নিয়োগ করবেন স্বদেশি শিল্পে। দলে দলে এসেছেন যুবক ও বৃদ্ধ, ধনী ও গরিব, পুরুষ ও নারী— যার যা সামর্থ্য সম্বল নিয়ে। তিন সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র মূলধন (১৬,৩০,০০০ পাউণ্ড) সংগৃহীত হয় ৮ হাজার ভারতবাসীর কাছ থেকে।' কারখানা নির্মিত হল— মেসার্স টাটা অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড নিযুক্ত হলেন ম্যানেজিং এজেন্টস। ১৯১০ সালে লোহা উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে লাভের পরিমাণ হয়েছিল ৮,৫৪,৫৮৩ টাকা। (ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা, ড. প্রিয়তোষ মৈত্র)।

অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির যে শৈশবকাল শুরু হয়েছিল, বিশ শতকের লৌহ ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা ও দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে সে তার যৌবনে পদার্পণ করল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমন ও পরবর্তী কালে বিদেশি শাসন ও শোষণের ফলে ভারতের সে দিনের চলতি অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হয়— বিধ্বস্ত কুটির শিল্প কারিগর, জমিতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ভূমিহীন কৃষক— এঁদের নিয়েই ভারতে দিনমজুরের জন্ম হয়।

বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের পর অবাধ বাণিজ্য প্রবর্তনের পরবর্তী কালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের যন্ত্রশিল্পের স্বল্পমূল্যের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

কুটিরশিল্পের পণ্যের পরাজয় ও তার ফলে তাদের ধ্বংস অতি দ্রুত ঘটতে থাকে। তার পর ১৮১৪ সালে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজ নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতের জাহাজ নির্মাণ কারখানা ও নৌশিল্পের পতনের শুরু হয়। সে দিন ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য থেকে ভারতীয় নাবিক ও লস্কর পরিচালিত জাহাজে প্রাচ্য থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করা হয়। ক্রমে লোহা ও চামড়ার কাজেও মন্দা ঘটে, যার ফলে অনেক লোক সে দিন কর্মচ্যুত হয়। জনসাধারণের কী শহরের, কী গ্রামের স্বাভাবিক ও পুরাতন জীবিকার উপায় বিধ্বস্ত হয়— ফলে আবির্ভাব ঘটে দিনমজুরদের।

এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে সে দিন ভারতে বৈদেশিক মূলধন আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজে অগ্রদূত ছিলেন ইউরোপীয় এজেন্সির হাউসগুলি। এদের সঙ্গে অবশ্য 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোং' বা 'দ্য ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' প্রভৃতি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নামও করা যেতে পারে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য সে দিন এ দেশে আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে ভারতীয় মূলধন অতি নগণ্য ছিল। পার্শি ও গুজরাতিরা ছাড়া অন্যান্য জাতি বা শ্রেণি ব্যবসা ছাড়া অন্য বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল অনেক বেশি। অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায় বিনিয়োগের মতো পুঁজি যাদের ছিল তারাও ব্যবসার পরিবর্তে অন্য বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হতেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে দিন ভারতের প্রয়োজনীয় মূলধন, ব্যবসায়ী প্রতিভা ইত্যাদি কিছু কিছু ব্যবসায় যুক্ত ছিল, অথচ পরিণামে ভারতে শিল্পের বিকাশ ঘটল না।

বিদেশি কোম্পানিগুলি নিজেদের স্বার্থে এ দেশের ধন ঐশ্বর্য দিনের পর দিন তাদের দেশে পাঠাতে থাকে। কোম্পানি ও বিদেশি বণিকদের অনুসৃত নীতি ও অত্যাচার-জুলুমবাজির ফলে সে দিনের সওদাগর শ্রেণির ক্রমাগত পুঁজি কমতে থাকে এবং তাঁদের নতুন ধরনের ব্যবসা করার মতো দুঃসাহস ছিল না। তার অন্যতম কারণ ছিল মূলধনমূলক সম্পদ ক্রমাগত দেশের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সওদাগর শ্রেণির মানুষরা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভীত ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছিলেন। ১৮১৩ সাল পর্যন্ত কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের আমলে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাওয়া একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বিত্ত সে দিন ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ও শিল্পায়নের পক্ষে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হিসাবে কাজ করেছে। ফলে সে দিনের

অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা বণিকবৃত্তিতন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক বিকাশে রূপান্তরিত হল না এবং এই গতির মুখ ঘুরিয়ে অতীত দিনের কৃষিমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হল। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭৬ সাল অবধি দেশীয় রাজন্যদের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া বহু মূল্যবান উপঢৌকন, উপহার প্রভৃতি ইংল্যাণ্ড চালান করা হয়েছে। আবার কোম্পানির আমলে উচ্চ বেতনের কর্মচারী ও কিছু ব্যবসায়ীদের সঞ্চিত বিপুল বিত্ত সে দিনের জাতীয় আয়ের পক্ষে গুরুভার হয়ে উঠেছিল। কোম্পানির একচেটিয়া রাজত্বে ভারতে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োগকে কোম্পানি কোনও সময়ই উৎসাহ দেয়নি। এক দিকে দেশীয় পুঁজি অপ্রতুল অন্য দিকে কোম্পানির শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ সম্পূর্ণ নেতিবাচক মনোভাবের ফলেই ভারতে বৃহৎ ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না।

পশ্চিম ভারত ছাড়া সর্বত্রই মূলধন খাটাবার প্রধানতম ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ভূমি। লর্ড কর্নওয়ালিসের ভূমি ব্যবস্থার কল্যাণে আগের দিনের ব্যবসায়ী ও কারবারি সম্প্রদায় সে দিন ক্রমশ জমিদার শ্রেণিতে পরিবর্তিত হতে থাকলেন।

১৮ শতকের শেষ পর্ব থেকে ১৯ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজ কোম্পানির শাসনকাল ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তরের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উল্লিখিত সময়ে ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ করে শ্রেণিবিন্যাসে অপরিহার্যরূপে পরিবর্তন ঘটেছে।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় রাজদণ্ড বিদেশিদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে অর্থাৎ ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রাধান্য স্থাপন করার এবং নিজেদের দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে, ফলে দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণির মনে বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভই রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধে রূপ নেয়। অন্যান্য দেশেও ধনতন্ত্রগত অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ভাবধারার উন্মেষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের নজির আছে ইতিহাসে। ওই সব দেশে দেখা গিয়েছে, ধনতন্ত্রগত অর্থনীতি, জাতীয়তাবোধ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ভাবধারার সঙ্গে প্রথমেই তাই দেখা যায় সে দিনের প্রচলিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিগত ভাবধারা—বিধিব্যবস্থার প্রবল সংঘর্ষ। নতুন শক্তির কাছে পুরাতনকে পরাজয় মেনে

নিতে হয়েছে। তা ছাড়া দুর্বল সামন্ততন্ত্রগত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাতে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পাশ্রিত ধনতন্ত্রগত অর্থনীতির বিকাশ অসম্ভব। দৃঢ় রাষ্ট্রব্যবস্থা, গণ্ডিবদ্ধ ধর্মীয়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনচর্চা ও চর্যার পরিবর্তে উদার, চুক্তিভিত্তিক, আত্মবিশ্বাস ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা সম্পন্ন জীবনচর্চা ও চর্যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য পরিবেশ। তাই যন্ত্রশিল্পাশ্রিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থনীতির প্রতিভূ মধ্যবিত্তশ্রেণির সঙ্গে দুর্বল ফুরিয়ে আসা সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ধনতন্ত্রাশ্রিত গণতান্ত্রিক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত জীবনবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় ভাবধারায় সৃষ্ট নতুন সমাজজীবনের শুভ উদ্বোধন ঘটে। সে দিনের সমাজমানসের পুরোধায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন, সামন্তযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্যমহীন সমাজমানসকে নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক কাজ। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজমানসে ধর্মগত ও সমাজগত সংস্কার এবং শেষে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে। সেই আন্দোলনকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। পাশাপাশি ইউরোপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারে শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রসার ভারতীয় সমাজজীবনেও অলোড়ন সৃষ্টি করল। এই আলোড়ন রূপান্তরিত হয় বলিষ্ঠ মানসিকতায়, স্বজাতি সচেতনতায় আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের। উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবোধের, গণতান্ত্রিক চেতনায় ও ভাবধারায়। এই প্রেক্ষাপটেই শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ইতিহাস আলোচ্য।

ধর্মঘট হরতাল বন্‌ধ

ভারতবর্ষের সর্বত্রই সাধারণ মানুষ 'ধর্মঘট' শব্দটির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। ধর্মঘট বলতে সাধারণ ভাবে কলকারখানায় শ্রমিকশ্রেণির বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সংগ্রামের অর্থাৎ পুঁজি ও শ্রমের পরিণতিতে সামগ্রিক বা আংশিক ভাবে কাজ বন্ধ করে দেওয়াই বোঝায়। শ্রমজীবী মানুষের দাবিদাওয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নয়, কিন্তু জনসাধারণের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের দাবিতেও ধর্মঘট হয়ে থাকে। সরকারি নীতির প্রতিবাদে ও জনস্বার্থের প্রশ্নে বিশ্বের সর্বত্রই ধর্মঘট সংগঠিত করা রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম কৌশলগত কর্মসূচি। ধর্মঘট কার্যত শাসক ও শাসিতের মধ্যে, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে, সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ প্রতিরোধের যে সংগ্রাম কখনও সোচ্চার, কখনও বা নিরুচ্চার ভাবে নিরন্তর প্রবাহিত, তারই কৌশলগত পদক্ষেপ ধর্মঘট। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রবাহিত এক যুদ্ধ। বিশ্বের যে কোনও দেশের যে কোনও রাজনৈতিক দল আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ করেই যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার ক্ষেত্রে ধর্মঘট অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। দর্শনগত অবস্থান থেকে যে রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন সমূহ পরস্পরের বিরোধী, তারা সহিংস বা অহিংস যে দর্শনেই বিশ্বাস করুক না কেন, সকলেই প্রয়োজন

অনুসারে ধর্মঘটের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকেন। এই ধর্মঘট শুধু শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের বা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ছাত্র-যুব সমাজ ও শিল্পী, সাহিত্যিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ধর্মঘট অনিবার্য।

আবহমানকাল বিভিন্ন রূপে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সার্বিক ভাবে কলকারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট— হাটবাজার, পরিবহণ ইত্যাদি বন্ধ থাকলেই বলা হয় ধর্মঘট, কিন্তু ধর্মঘটের প্রকাশ সব সময় একই ধরনের হয় না। আংশিক ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট, অনশন ধর্মঘট হতে পারে, অফিস-আদালতে কলম ধর্মঘট হয়ে থাকে, ধর্না, ঘরে ঘরে অরন্ধন ইত্যাদিও ধর্মঘটের বিভিন্ন ধরনের কৌশলগত প্রতিফলন। ধর্মঘট ও হরতাল সমার্থক হলেও বন্‌ধ শব্দটির সঙ্গে অর্থগত পার্থক্য আছে।

বন্‌ধ কথাটি সার্বিক ভাবে সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া বোঝায়। অফিস-আদালত, কলকারখানা, পরিবহণ, দোকানপাট-হাটবাজার, বিদ্যায়তন সবই বন্‌ধের তালিকায় পড়ে। কিন্তু হরতাল বা ধর্মঘট আংশিক হতে পারে, কলকারখানায় আংশিক ভাবে বিভাগীয় ধর্মঘট হতে পারে। সর্বাত্মক বন্‌ধ নাও হতে পারে।

বন্‌ধ কথাটির একাধিক অভিধানিক অর্থ আছে, কিন্তু ধর্মঘট বা হরতাল সমার্থক লেখা দেখা যায়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে লিখেছেন, 'বন্ধ-অবরোধ, নিরোধ, বন্দিকরণ, গতিরোধসাধন, রুদ্ধ ইত্যাদি। রাজশেখর বসু চলন্তিকায় লিখেছেন— বন্ধ যাহার কর্ম স্থগিত আছে (দোকান, কাছারি—)।' বিভিন্ন অভিধানে একই অর্থ বা সমার্থক লেখা আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনেক সময় হরতাল ডাকা হলেও তা কার্যত বন্‌ধে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল যখন বন্‌ধ আহ্বান করে, তখন প্রয়োজন বল প্রয়োগের মাধ্যমে বন্‌ধ সফল করার কার্যক্রম দেখা যায়। সম্প্রতি তামিলনাড়ু হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট মামলায় বন্‌ধকে সংবিধান বিরোধী বলে বেআইনি করেছেন। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি ধর্মঘটের আহ্বান জানালে তাকে বন্‌ধে পরিণত করার প্রচেষ্টা থাকে। ধর্মঘট, হরতাল বা বন্‌ধ সর্বাত্মক হলেই সরকারকে আঘাত করা যায়।

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মঘটের নানা ধরনের রকমফের দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের যুগ থেকেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ ও

প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে। মুঘল যুগে আমির ও ওমরাহদের উৎপীড়নের প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরতাল বা ধর্মঘট পালিত হয়েছে। মিরাট-ই-আহমাদির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য থেকে জানা যায়, ভারতীয় বণিকদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ 'হরতাল বা ধর্মঘটের' মধ্য দিয়ে ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের কুতুবশাহী শাসনের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানাতে হায়দরাবাদের মহাজনরা হরতাল ও বন্‌ধ পালনের সাহসিকতা দেখায়। (গৌতম ভদ্র, মুগল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, ১৯৮৩, পৃ. ৩০৯)

সম সময়ে আদিল শাহির রাজ্যে বণিকদের কয়েকটি অঞ্চলে হরতাল পালনের সংবাদ ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। মুঘল যুগে ১৬৩০ সালে ব্রোচে ও ১৬৮৬ সালে মাদ্রাজে তাঁতি সম্প্রদায় অত্যাচার ও মুঘল কর নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাপক ভাবে ধর্মঘট পালন করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৮৮—১৬৬৯ সময়কালে সামান্য একটি ধর্মান্তরণ কেন্দ্র করে সুরাটের বণিক সমাজ ধর্মঘট পালন করে। মুঘল শাসকদের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের আমলে সরকারি কর নীতির প্রতিবাদে দিল্লির বণিকরা 'হরতাল ও বন্‌ধ' পালন করে অত্যাচারী মুঘল প্রশাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন। মুঘল যুগে হরতাল বা ধর্মঘটের ব্যাপক প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। আকবরের আমলেও কর বসানোর প্রতিবাদে কারিগরেরা হরতাল পালন করে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়ে এসেছে। এদের জীবনযাত্রা মুঘল যুগে অসহনীয় হয়ে ওঠে। মুঘল সম্রাটদের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তার বিবরণ পাওয়া যায় মানুচির লেখা থেকে— 'আকবরের বিরুদ্ধে জীবিত অবস্থায় প্রতিশোধ নিতে না পারায় আগ্রার জাঠ কৃষকরা আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর সমাধি আক্রমণ করে ব্যাপক লুঠতরাজ করে এবং আকবরের দেহাবশেষ খুঁড়ে বের করে জ্বালিয়ে দেয়। (গৌতম ভদ্র, মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, পৃ. ২০১)। মুঘল যুগে প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বণিক ও শ্রমজীবী মানুষের হরতাল পালন ছিল প্রতিবাদের স্বাভাবিক ঘটনা এবং রাজশক্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের একটি পদ্ধতি। মধ্যযুগে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে যে সব হরতাল বা ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছে, তা যে কোনও শাসনের অন্যায়

ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিবাদের ভাষা বলা যেতে পারে এবং 'মুঘল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সুসংবদ্ধ সমাজ রাজনৈতিক চেতনায় কোনও না কোনও ভাবে একটা ছাপ ফেলেছিল, একথা অনস্বীকার্য' (পৃ. ২৩০)।

তবে এ কথা ঠিক যে প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের সংজ্ঞা, অর্থ বা প্রকৃতি যে ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার সঙ্গে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হরতাল বা ধর্মঘটের প্রকৃত অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। এই সময়ে ধর্মঘটগুলি মুখ্যত শাসক সম্প্রদায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ক্ষোভ, বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঘটেছে, সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতির তেমন বিশেষ কোনও যোগ ছিল না। বরং ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তখন ধর্মঘট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত ভাবে সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে সমাজচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মঘটের সংজ্ঞা, উৎস ও প্রকৃতি

ধর্মঘটের উৎস মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। 'ধর্মঘট হল ধর্মার্থে বৈশাখ মাসে প্রত্যহ দেয় গঙ্গোদকপূর্ণ সভোজ্য সদক্ষিণা চন্দনাক্ত কলস। কিংবা ধর্মসাক্ষীপূর্বক স্থাপিত ঘট (বারি)। কিংবা কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সকলে সমবেত হইয়া কোনও কার্য করা বা না করা সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করে। কিংবা বাণিজ্যের পূর্বে দোকানদারেরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অথবা কোনও দ্রব্য এই নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিব তার কম মূল্যে বিক্রয় করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘটস্থ ধর্মকে সাক্ষী রাখিত বলিয়া এই নাম।' (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বঙ্গ ভাষার অভিধান)।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের আর একটি ধর্মীয় প্রথা বা ব্রতের মধ্যেও ধর্মঘটের তাৎপর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাবিষুব সংক্রান্তির অক্ষয় তৃতীয়া অথবা সৌর বৈশাখের যে কোনও দিনে জলপূর্ণ ঘট উৎসর্গ আনুষ্ঠানিক বীজমন্ত্রের মধ্যে ধর্মঘট কথাটির উল্লেখ কোনও অর্থবহ ও তাৎপর্য সমন্বিত: ওঁ এষ ধর্মঘটো দত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক। অস্য প্রদানং সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ। (গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা, ১৩৯০, পৃ. ৩৩৩)। ধর্মের নামে জলপূর্ণ ঘটকে সাক্ষী রেখে কিংবা কোনও কিছুর সাফল্য কামনা করে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করা হয় ঘটের সামনে সেই ঘটকেই 'ধর্মঘট' জ্ঞানে ও

ধ্যানে পূজার্চনা করে বলতে শোনা যায়: ওঁ ঘট ত্বং রূপোহাসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। ত্বয়ি সন্তু নিপ্তাশ্চান্দনৈঃ সর্বদেবতা। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩)

বাংলাদেশের সমাজজীবনে ধর্মঘট কথাটি ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে ধর্মের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বের। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় জাতিগত ও বর্ণগত ঐক্যের ক্ষেত্রে বংশপরম্পরায় সকলে একই বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকত। স্বর্ণকার, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রমুখ বংশানুক্রমিক পেশাগত শিল্পী ছিলেন যেমন, তেমন তারা স্বতন্ত্র জাতি বা শ্রেণি হিসেবে মর্যাদা পেতেন। অর্থাৎ পেশাগত সূত্রে জাতি ও সম্প্রদায়গত পরিচয় গড়ে উঠত, যাকে 'ট্রেড কাস্ট' বলা হয়। জাতিভেদ প্রথার সামাজিক বিধিনিষেধগুলিও কঠোর ভাবে পালিত হত। এক পেশায় নিযুক্ত সম্প্রদায় অন্য পেশায় যুক্ত হতে পারত না। অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন সূত্রধরের কাজ করতে পারত না, তেমন তন্তুবায় কখনও কর্মকারের কাজ করত না। প্রাচীন ভারতের কৃষিনির্ভর সমাজে আঞ্চলিক প্রয়োজনভিত্তিক বাজার প্রতিযোগিতাবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রতিটি পেশার মানুষকে জীবিকা আইনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। সে কারণে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলার বাইরে কোনও কিছু করার সাহস পেত না। সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ, লোকাচার সবই জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যে যার গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই সমাজজীবন নির্বাহ করেছে।

গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও বর্ণগত সামাজিক অনুশাসন যাতে কেউ উপেক্ষা করতে না পারে এবং যে কোনও কারণেই হোক না কেন, ধর্ম পরিত্যাগ করতে না পারে তার জন্য সমাজে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল 'ঠেকো' করে রাখা। ধর্মঘটের সামাজিক তাৎপর্য কত ব্যাপক ছিল, সেটা বুঝতে হলে 'ঠেকো' কথাটির সামাজিক প্রয়োগ জানা প্রয়োজন। ঠেকো করার প্রথম ও প্রধান উপায় ছিল ধর্মঘট।

একই সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও বৃত্তির মানুষরা ধর্মঘট স্থাপন করতেন। গঙ্গোদকপূর্ণ ওই ঘটকেই ধর্মঠাকুর জ্ঞানে পুজো করা হত। ধর্মঠাকুরের যেহেতু কোনও মূর্তি নেই, সেহেতু সঠিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসারে ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঘট পুজোর অনুষ্ঠান করলে সেখানে ধর্মঠাকুরের অবস্থান হবে, এটাই

ছিল মানুষের বিশ্বাস। এই ঘট যেখানে স্থাপন হত, সেই স্থান অতিক্রম করে যাওয়া নিষেধ ছিল। ধর্মঠাকুরের ঘটের সামনে এসে যে কোনও ব্যক্তিকেই থেমে যেতে হবে। পুজো শেষ হওয়ার পর ঘট সরিয়ে নেওয়া হলে আবার যাতায়াত করা সম্ভব।

ধর্মঘট স্থাপন করে সেই চত্বরে সমবেত জনসাধারণের সামনে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও ব্যক্তিগত সমস্যাবলি বা অভিযোগ উল্লেখ করে পরস্পরে আলোচনা করতেন। সমস্যা সমাধানের অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই আলাপ-আলোচনাকে বলা হত 'ঘোঁট' অর্থাৎ বিষয়টিকে ঘোঁট পাকিয়ে বা ঘুঁটিয়ে নিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হত। এই ঘট স্থাপনা ধর্মযাজী বা ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত রূপে পরিচিত ও খ্যাত ব্যক্তির দ্বারাই করা হত। জলপূর্ণ ঘটের মুখে আম্রপল্লব সাজিয়ে ঘটের গায়ে তেল সিঁদুর দিয়ে একটি চক্র এঁকে সেই চক্রের নীচে যার বিরুদ্ধে ধর্মঘট স্থাপনা হয়েছে, তার নাম লেখা থাকত। নিয়মানুসারে ধর্মরাজের পূজার্চনার পর সমবেত গ্রামবাসীরা পান ভোজন করতেন। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যেক জাতির মাতব্বরগণ একটা পান, সুপারি ও হরিতকী নিয়ে ঘট স্পর্শ করে শপথ করতেন যে আজকের ঘোঁট অনুসারে ধর্মঠাকুরের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বা স্থিরীকৃত ব্যবস্থা অনুসারে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আমরা স্বীয় শিল্প সামগ্রী জোগাব না। ধর্মরাজের পান সুপারি গ্রহণ করে জানাচ্ছি যে, হুকুম অমান্য করব না, আমার গ্রামের সকলকে ঘোঁট-এর হুকুম মানতে বাধ্য করব। অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ধর্মঘটের সামনে অনুষ্ঠিত ঘোঁট অনুসারে অন্য গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দ্বারা সামাজিক ভাবে বয়কট করা হত। এই শাসন অতি কঠোর ছিল, এমনকী মুসলমান সমাজও এই সামাজিক শাসন অমান্য করতে পারত না। অর্থাৎ এই ভাবে যাদের 'ঠেকো' করে দেওয়া হল তাদের সমস্ত জনবলই নষ্ট হয়ে যেত।

গ্রামের অথবা সম্প্রদায়ের মাতব্বরগণ ধর্মঘট মাথায় নিয়ে ঢাক বাজাতে বাজাতে আশপাশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ঘোঁট অনুসারে তাদের প্রতি আরোপিত শাস্তি ঘোষণা করতেন। ধর্মের ঢাকে একবার কাঠি পড়লে অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশ ছাড়া হয়ে যেত। এই ধরনের সামাজিক অনুশাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন সকলেরই ওপর প্রযোজ্য ছিল। এক সময় মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে

তন্তুবায় শ্রেণি ধর্মঘট পালন করলে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীও সেই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। সে কালের সামাজিক জীবনে ধর্মঘটের অনুশাসন কঠিন, কঠোর ও নির্মম ছিল। নন্দকুমারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছিল যে, কোনও হাটেই কোনও তাঁতি তাঁকে কাপড় বিক্রি করত না। শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারকেই ভুল স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে ধর্মঘটের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মঘট শব্দটি প্রতিজ্ঞা পালন অর্থে বোঝানো হয়েছে। মহাভারতের কাহিনি যে সময়ের, তখন ধর্মের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার মধ্যেও ধর্মঘটের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। ধর্মশব্দের দু'টি অর্থের উল্লেখ রয়েছে মহাভারতে। প্রথমটি 'ধনপূর্বক' 'ঋ' ধাতুর উত্তর মক প্রত্যয়; যা করলে ধর্ম শব্দটি সিদ্ধ হয়। তার অর্থ যা থেকে ধন প্রাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয়টি 'ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন' প্রত্যয় যোগ করলে ধর্ম শব্দটি পাওয়া যায়। এই ধর্মের অর্থ, যা সকলকে ধারণ করে অর্থাৎ সমাজ যার উপর নির্ভরশীল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত সম্পাদিত: পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলি, পৃ. ৬৪)। এই ধর্মের সঙ্গে প্রচলিত বিধি অনুসারে পূজার্চনার সময় ঘট যুক্ত করে ধর্মঘট মানুষকে মহত্তর আদর্শে প্রাণিত করে এবং অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্তি করে। ধর্ম ও ধর্মঘটের উদ্দেশ্য প্রায় সমার্থক। বাঙালির সমাজ জীবনে আচার ও অনুষ্ঠানে লোকহিতে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট ব্যাপক অর্থবহ হয়েছে। ধর্মঘট সামনে রেখে 'ঠেকো' করে রাখার যে পদ্ধতি চালু ছিল তার অন্তর্নিহিত অর্থ কোনও অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধের বা প্রতিকারের প্রতিজ্ঞা করা। অথবা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিজ্ঞা করার নিমিত্তেই ধর্মঘট স্থাপন করা হত।

কোনও ব্যক্তিকে সমাজ যদি 'ঠেকো' ঘোষণা করে তবে তার ধোপা, নাপিত, ঘরামি, তবলদার নফর, তল্পিদার প্রভৃতি সকল জনবলই নষ্ট হত।

'ঠেকো'র ঘরের কাউকেও মুসলমান ইমামগণ ইসলামধর্মে দীক্ষিত করত না। এমন সামাজিক অনুশাসনে রাজা-প্রজা কেউ বাদ যেত না।

ধর্মঘটের ব্যাপক প্রচারিত অর্থ প্রতিজ্ঞাপূর্বক বন্ধ করা, যাকে পরবর্তী কালে 'স্ট্রাইক' বলা হয়, ধর্মঘটের সেই অভিমুখই বিশ্বের সাধারণ মানুষ সর্বসম্মত ভাবে গ্রহণ করেছেন। কার্যত দুশো বছরেরও অধিক সময় ধরে

স্থূল বিচারে বস্তুভিত্তিক ন্যায্য প্রাপ্যই ধর্মঘটের মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। তবে ধর্মঘটের যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। গান্ধীজি মনে করতেন ধর্মঘট হল সুবিধালাভের প্রত্যাশায় তাৎক্ষণিক কার্যপদ্ধতি। ভারতে মুঘল যুগে হরতালকেই ধর্মঘটের পরিপূরক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হত। 'হরতাল' শব্দটি বাংলায় বহুল ব্যবহার হলেও আদতে হরতাল গুজরাটি শব্দ। অভিধান প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে হরতাল শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, ফরাসি 'হর' শব্দের সঙ্গে গুজরাতি 'তালু' শব্দটি যুক্ত হয়ে হরতাল কথাটি চালু হয়েছে। 'হর' কথার অর্থ প্রত্যেক বা প্রতি ব্যক্তি আর তালু কথার অর্থ কুলুপ বা বন্ধ করা। অর্থাৎ হাটে-বাজারে বেচাকেনা বন্ধ অর্থেই হরতাল কথাটি ব্যবহার হয়ে আসছে। বন্ধ কথাটি বিভিন্ন অর্থে সুপ্রচলিত, বন্ধ থেকে বর্তমানে বন্‌ধ কথাটি চালু হয়েছে। মুসলমান শাসনব্যবস্থায় হরতাল ছিল প্রতিবাদের স্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু ইসলাম দর্শনে বলা হয়েছে 'হরতাল' অমুসলমান প্রবর্তিত একটি কার্যপদ্ধতি। মুস্তাফা নুরউল ইসলাম 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' (১৯০১—১৯৩০, ঢাকা, পৃ. ২৪৪) গ্রন্থে লিখেছেন— 'হরতালে গরিবদের ওপর ভীষণ জুলুম করা হয় এবং এর দ্বারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকে নানা অন্যায় ও অত্যাচার করার সুযোগ পায়।'

সময়ের নির্দিষ্ট নিয়মে দেশকালপাত্রভেদে যে কোনও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন হতে বাধ্য। ধর্মঘটের যে ব্যাখ্যা ধর্মমঙ্গল কাব্যের সময়ে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে কালে সেই ব্যাখ্যারও বিশ্লেষণের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ধর্মঘটগুলির প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার নিঃসন্দেহে ধর্মঘট। অন্যান্য প্রতিবাদ আন্দোলন ধর্মঘটের মতো শক্তিশালী নয়। ধর্মঘট বা হরতাল কার্যত অচলাবস্থা সৃষ্টি করে দেয়।

আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনধারণের প্রক্রিয়া, পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। পরিস্থিতির যে ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, সেই অনুসারে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের যে সংগ্রাম, তারও পরিবর্তন হয়। নিত্যদিন যে সংগ্রাম করেই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, তার একটি অন্তর্নিহিত আবেদন থাকে, যা সর্বক্ষেত্রে একই মাত্রায় বা আবহমানকাল একই বক্তব্যের অনুসারী হয় না। কিন্তু আবেদনের পার্থক্য থাকলেও,

প্রতিবাদের ভাষা ও আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার অভিমুখ একই ধরনের হয়ে থাকে। তবে কৌশলগত পরিবর্তন হয়। যে কারণে ধর্মঘটের প্রয়োগ-পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের ধর্মঘট সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে রাজনীতির দর্শন চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে, শুধু আবেগ বা স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ভর হয় না। কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় ধরে প্রচার গড়ে তুলে ধর্মঘটের বিষয়গুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হয়। শাসকের রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা আরোপিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধর্মঘটের মতো শক্তিশালী হাতিয়ার বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আর নেই।

ধর্মঘটেরও প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ধর্মঘট বা হরতাল মানেই সার্বিক ভাবে সব কিছুই বন্ধ রাখা না-ও হতে পারে। ধর্মঘটের পদ্ধতিকে প্রতিবাদের বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন অবস্থান ধর্মঘট, অনশন ধর্মঘট, প্রতীক ধর্মঘট, কলম ধর্মঘট বা 'ওয়ার্ক টু রুল' সহ ধরনা ইত্যাদি। ঐক্যবদ্ধ ভাবনাচিন্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৌশল। ধর্মঘটের বিভিন্ন কৌশল মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে প্রেরণা দিয়েছে। কার্যত ধর্মঘটের কোনও বিকল্প পন্থা হয় না।

অনশন, ধরনা ও অবস্থান ধর্মঘট: অতি প্রাচীনকাল থেকে সমাজে দাবি জানাতে বা অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে ধরনা ও অবস্থান ধর্মঘটের প্রয়োগ দেখা যায়। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের একটি ঘটনাসূত্র থেকেই 'অবস্থান ধর্মঘট'-এর পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে ভারতে অবস্থান ধর্মঘট বা ধরনার প্রকৃত পরিচয় আছে (রাজশেখর বসু, বাল্মীকি রামায়ণ, পৃ. ৩৮৯)। মনুসংহিতায় বলা আছে— 'প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য উত্তমর্ণগণ অধমর্ণের দ্বারে হত্যে দিয়ে থাকেন।'

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শম্বুকের শিরশ্ছেদ অংশে উল্লেখ আছে— এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের মৃত্যু হলে সুবিচারের আশায় সেই ব্রাহ্মণ মৃত বালকের মরদেহ সঙ্গে নিয়ে রামের সভাস্থলে প্রবেশ করে। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে কাতর হয়ে দুঃখে ভেঙে পড়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 'হা-পুত্র, হা-পুত্র' বলে রাজদ্বারে রোদন করতে থাকলেন। আরও বললেন, আজ আমি ভার্যার সঙ্গে অনাথের ন্যায় এই রাজদ্বারে প্রাত্যত্যাগ করব। ব্রাহ্মণ অভিযোগ করলেন— প্রজারা রাজার দোষেই নষ্ট হয়ে থাকে, রাজা

অসচ্চরিত্র হলে প্রজার অকালে মৃত্যু ঘটে। অথবা বোধ হয় প্রজারা পাপ আচরণ করছে আর সেই পাপের সময়োচিত প্রতিবিধান হচ্ছে না। রাজদোষেই এই সব ঘটছে। রামকে ভর্ৎসনা করে মৃত পুত্রকে জীবিত করার দাবিতে পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে রাজদ্বারে ধরনা দিতে লাগলেন। (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য: বাল্মীকি রামায়ণ (অনুবাদ) ২য় খণ্ড ১৯৭৬, পৃ. ১০১৭-১৮)। সেই সময় অবস্থান ধর্মঘট ও ধরনা দাবি জানাবার বিশেষ কৌশল হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। সাম্প্রতিক কালেও অবস্থান ও ধরনা আন্দোলনের সেই পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। অবস্থান ও ধরনা সম্পূর্ণ ভাবে কাজ বন্ধ করা ধর্মঘট নয়, কর্মস্থলে নির্দিষ্ট সরকারি বা অসরকারি দফতরের সামনে সাময়িক বা লাগাতার বিক্ষোভ প্রদর্শনকেই বোঝানো হয়। সমগ্র দেশে যখন প্রতিদিনই বহু অবস্থান বিক্ষোভ, ধরনা ও ধর্মঘট অহরহ ঘটে চলেছে।

বর্তমানে অবস্থান ধর্মঘটের অভিমুখ বলতে বোঝায় শ্রমিক-কর্মচারী সহ যে কোনও পেশার মানুষ নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে ও প্রকাশ্য স্থানে দিনের পর দিন বসে থেকে যে ধর্মঘট পালন করেন সেটাই অবস্থান ধর্মঘট। অবস্থান বা ধরনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান ধর্মঘটে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাসে অনশন ধর্মঘট একটি সফল কৌশল ও শক্তিশালী হাতিয়ার। অবস্থান ধর্মঘটের তুলনায় অনশন ধর্মঘটের আঘাত করার ক্ষমতা অনেক বেশি। অনশনের মাধ্যমে যে ধর্মঘট পালন করা হয় তাকেই অনশন ধর্মঘট বলা হয়। অনশন বহু ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে মান্যাত পেয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে অনশন সমাজজীবনে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

ভারতীয়দের ধর্মীয় জীবনে অনশন ব্রত ধর্মের অঙ্গ হিসাবে পালিত হয়। অন্যান্য ধর্মেও অনশন একটি স্বীকৃত ধর্মীয় পদ্ধতি। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বশিষ্ঠ সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অনশনকে ধর্মাচারণের পবিত্র পদ্ধতিরূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় রীতি ও পদ্ধতি পালনের জন্য অনশন আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে যে অনশন তার মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে বা কলকারখানায়, খেতখামারে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে যে ধর্মঘট সংগঠিত হয়ে থাকে তার সঙ্গে অনশন যুক্ত হয়ে অনশন ধর্মঘটে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ অনশন ব্রত রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অনশন ধর্মঘট

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির মান্যতা পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন যতীন দাস লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শহিদের মৃত্যু বরণ করলেন, তখন সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠল। যতীন দাসের আত্মত্যাগ দেশবাসীকে অস্থি-মজ্জায় নাড়া দিয়ে গেল। সেদিন সমগ্র বাংলায় অরন্ধন হল। কার্যত কোনও আহ্বান ছাড়াই জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেল। গান্ধীজি মনে করতেন যখন ন্যায় বিচার পাওয়ার অন্য কোনও পথ বা পদ্ধতি কার্যকর থাকে না, একমাত্র তখনই সত্যাগ্রহীদের অনশন করা উচিত। গান্ধীজির অনশন স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল শুধু তাই নয়, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্র রাজবন্দিদের অধিকারের দাবিতে প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিবিশেষের অনশন ও সত্যাগ্রহীদের অনশন ধর্মঘট এক উচ্চ মাত্রা যোগ করেছিল।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য অনশনের ঘটনা হুগলি জেলার সিঙ্গুরে টাটাদের মোটরগাড়ি কারখানার জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০০৬ সালের ৪ ডিসেম্বর থেকে ২৬ দিন অনশন পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার পরিবর্তনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশনের ঘটনা অনুঘটকের কাজ করেছিল।

ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে ছোট, বড় ধর্মঘটের ভূমিকা যেমন শ্রমজীবী মানুষের মুখে ভাষা জুগিয়েছে, বয়কট আন্দোলন অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশে ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যুগেরও সূচনা করেছিল। ধর্মঘট ও বয়কট যুগ ও জীবনের প্রয়োজনকেই রূপ দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে সারা দেশেই অনশন ধর্মঘটের প্রয়োগ হয়েছে। বিশেষ করে যারা গান্ধীজির আদর্শে প্রভাবিত, তাঁরাই মুখ্যত অনশনের পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। সম্প্রতিককালে বামপন্থায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরাও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের আন্দোলনে অনশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। অনশন ধর্মঘট একটি সফল প্রক্রিয়া বা কৌশল হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু অনশন ধর্মঘটের অপপ্রয়োগও ঘটে থাকে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবিতে পট্টিশ্রী রামালুর অনশনে প্রাণত্যাগের পর সমগ্র দক্ষিণ ভারতে যে আগুন জ্বলে

উঠেছিল, তার পরিণতিতে জাতীয় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে শুধু তাই নয়, বহু জীবনহানিও ঘটেছে। অবশেষে রাজ্যভাগ হয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যখন অনশন ধর্মঘটের প্রয়োগ হয়, তখনই বলা যেতে পারে এই শক্তিশালী পদ্ধতির অপপ্রয়োগ ঘটে।

কলম ধর্মঘট ও ওয়ার্ক টু রুল কার্যত আংশিক ধর্মঘট। এই ধরনের আন্দোলনে সরাসরি কাজ বন্ধ রাখা বা অচল করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয় না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আন্দোলনগুলির ফলে অফিস-আদালত খোলা থাকলেও কার্যত কাজ হয় না। কর্মক্ষেত্রে যথাসময়ে হাজিরা দিয়ে কর্মচারীগণ কাজ বন্ধ রেখে কোনও নির্দিষ্ট দাবি পূরণের জন্য কলম ধর্মঘট করেন। এই আন্দোলন মুখ্যত সরকারি, আধা সরকারি দফতরেই হতে পারে। ফলে কারখানায় সম্ভব হয় না। কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক পদ্ধতিতে কাজ হয়। একটি মেশিন কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেলে সেই বিভাগে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার অর্থ হল আংশিক ধর্মঘট। কলম ধর্মঘট ও ওয়ার্ক টু রুল-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে এই ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মঘট করা হল না ঠিকই, কিন্তু এমন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কর্মচারীবৃন্দ গ্রহণ করলেন, যার ফলে বন্‌ধ হয়ে থাকল। তবে কলম ধর্মঘট শুধুমাত্র কেরানিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ওয়ার্ক টু রুল সর্বক্ষেত্রে হতে পারে। এই আন্দোলনের আইনি বৈধতা নেই। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আইনি বৈধতার উপর নির্ভর করে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আইনি বৈধতার উপর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক-সহ সমাজের কোনও অংশের মানুষের প্রতিবাদ, সব সময় নির্ভর করে না। নীল ধর্মঘটকে কেন্দ্রকরে ৩০.১১.১২৬৬ বঙ্গাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিবন্ধ লিখেছিলেন— 'নীলকরেরা দুঃখী কৃষকদিগকে ক্ষেত্রের কার্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত বলপ্রকাশ ও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন, এবং প্রজারাও একত্র হইয়া ধর্মঘট স্থাপন করিয়াছে, অল্প বেতনে আর নীলকরদিগের কার্য করিবেক না।...'

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এ দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক ধর্মঘট পালন করে নীলচাষে অস্বীকৃত হলে, নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর প্রবন্ধগুলি পাঠে নীলকরেরা বিশেষ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

উনিশ শতকে জমিদারদের অন্যায় অবিচার ও দরিদ্র প্রজাদের উপর

বলপূর্বক খাজনা আদায়ের মতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটই সারা দেশের প্রজাদের ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে সহজ ও সরল ব্যবস্থা, যা সমকালীন সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। যে কোনও অ-সম নীতির বিরুদ্ধে প্রজার প্রতিবাদের সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে ধর্মঘটই ছিল বলিষ্ঠ পদক্ষেপ (সূত্র: ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস, বাসুদেব মোশেল, পৃ. ১৪২—১৪৮)।

কলকারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীগণ অর্থনৈতিক দাবিতে ও কোনও অন্যায় অবিচারের প্রতিকারকল্পে লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত এ দেশে আছে। ১৯৪৫ সালে কলকাতা ট্রাম শ্রমিকরা ব্রিটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে ৭ দিন ব্যাপী ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে সক্ষম হন। ১৯৪৬ সালের ১১ জুলাই থেকে সারা ভারত ডাক ও তার কর্মীদের লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়। ১৯৫৫ সালে উত্তরবঙ্গে চা-বাগিচা শ্রমিকদের বোনাসের দাবিতে লাগাতার ১৮ দিনের ধর্মঘটের ফলে ভারতের চা শ্রমিকগণ বোনাসের অধিকার আদায় করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের একটি মানদণ্ড নির্ধারিত হয়। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা উক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের ও সকলের জন্য বোনাসের, মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ১১ জুলাই ১৯৬০ সালে ৫ দিন ধর্মঘট পালন করেন।

ছয়ের দশকে দুটি সংগ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি ১৯৬০ সালে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের দীর্ঘ ৬ মাস ব্যাপী ধর্মঘট। ১৯৬৬ সালের ৫ অগস্ট থেকে টানা ৯ দিন দুর্গাপুরের ইস্পাত শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত হয়। এই ধরনের লাগাতার ধর্মঘটে শ্রমজীবী মানুষ সামিল হয়েছেন।

১৯৭৯ সালে চটকল শ্রমিকদের ৫০ দিন ও ১৯৮০ সালে ৮০ দিন লাগাতার ধর্মঘট এই রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের ধর্মঘট ৪৬ দিন চলেছিল। সুতরাং লাগাতার ধর্মঘট শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। উপরিউক্ত আন্দোলন ও ধর্মঘট সম্পর্কে বিবরণ ও তথ্য পরবর্তী অধ্যায়ে আছে।

ভারতবর্ষে প্রথম লাগাতার ধর্মঘটের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে ১৮২৭ সালের কলকাতার পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটের মাধ্যমে। তার পর শ্রমজীবী মানুষের

আরও অনেক লাগাতার ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। প্রতিটি ধর্মঘটই কোনও না কোনও ভাবে সমাজজীবনে প্রভাব, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘটগুলি শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন বৃহত্তর সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলে। ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই মানুষ তার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার সামগ্রিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। ধর্মঘটের একাধিক পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও সমাজজীবনে অনশন ধর্মঘটের প্রভাব সব থেকে বেশি।

ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন কয়লাখনির দু'হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণির বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট সম্পর্কে 'মহান পদযাত্রা' বইতে তিনি লিখেছিলেন: ধর্মঘট পুরোদমে চলছিল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংগঠিত মিছিল রেলে ও পদব্রজে চলছিল। দুইজন মহিলা অসীম সাহসে ভর করে চার্লস টাউনে পৌঁছয়। পথে তাঁদের সন্তান বিয়োগ ঘটে। একটি শিশু মারা যায় চলার পথে অনাবৃত থাকার জন্য, আর একটি শিশু সাঁতার কেটে নদী পার হওয়ার সময় মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে গিয়ে। ভয় না পেয়ে, পিছিয়ে না পড়ে সেই মায়েরা এগিয়ে গিয়েছেন। একজন মা বলেছেন, আমরা মৃতের জন্য দুঃখ অনুভব করব না, আমাদের শত দুঃখানুভব সেই শিশুদের ফিরিয়ে দেবে না। যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য কাজ করে যাব।' (ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ: গান্ধী ও গান্ধীবাদ (১৮৮৩) পৃ. ৯)। সাধারণ শ্রমিকদের এই সংগ্রামী মনোভাব ও ত্যাগ স্বীকার গান্ধীকে প্রভাবিত করেছিল। দেশে ফিরে আসার পর গান্ধীজি নিজেও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ১৯১৮ সালে আমেদাবাদের সুতোকলের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজির নিজস্ব একটি দর্শন ছিল। তিনি মনে করতেন ধর্মঘটের ভাবনার মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অনুচিত। তবে ব্রিটিশ শাসকদের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটের পথে এগিয়ে চলার অভিমুখ ঘোষণা করেছিলেন। অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের মিশ্রণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত— এই ধরনের মিশ্রণের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন তো সাধিত হয়ই না বরং ধর্মঘটী শ্রমিকরা ধর্মঘটের দরুন তাঁদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত না হলেও বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে

পড়েন। ...রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলিকে তাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। এই ধর্মঘটকে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। অহিংস কার্যক্রমে রাজনৈতিক ধর্মঘটের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যথেচ্ছ ভাবে এর আশ্রয় গ্রহণ করলে চলবে না। এমন পরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে হিংসার সৃষ্টি না হয় (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী: গান্ধী রচনা সম্ভার/৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৯-৩০)। তিনি আরও মনে করতেন— 'যতক্ষণ না শ্রমিকরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বিপজ্জনক।'

ধর্মঘট প্রসঙ্গে গান্ধীজি 'ইংয় ইণ্ডিয়া' পত্রিকার ১৯২১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লিখেছেন— ধর্মঘটের কারণ ন্যায্য হওয়া উচিত, ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে কৌশলগত ব্যবহারিক ঐকমত্য থাকতে হবে, যারা ধর্মঘট করবে না তাদের প্রতি কোনও হিংসাত্মক আচরণ করা চলবে না, ধর্মঘট চলাকালীন ইউনিয়নের টাকার উপর নির্ভর না করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের নিজেদের জীবন নির্বাহ করা উচিত এবং এবং যেখানে ধর্মঘটীদের স্থান পূরণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় ধর্মঘট না করা শ্রমিকরা রয়েছে, সেখানে ধর্মঘট প্রতিকারের পথ নয়। যদি পরিস্থিতি এই রকম হয়, তা হলে অন্যায় অবিচারের ও কম বেতনের প্রতিবাদে কর্মত্যাগ করাই বিধেয়।

আবার গান্ধীজির শান্তির ধারণা কী রকম ছিল, সে বিষয়ে জানা যায় গান্ধীজি জনৈক ব্রিটিশ বন্ধুর দ্বারা প্রকাশিত 'নো মোর ওয়ার' পত্রিকায় ১৯২৬ সালের ১৮ নভেম্বর সংখ্যায় লিখেছিলেন— যে শান্তিবাদ কদাচিৎ সামরিক যুদ্ধের মধ্যে নিষ্ঠুরতা দেখতে পায়, আর আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন নির্দয়তা রয়েছে, তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকে, সেই শান্তিবাদের কোনও মূল্যই নেই।

গান্ধীজি অহিংস ধর্মঘটের পক্ষে ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি মনে করতেন ধর্মকে বাদ দিয়ে অহিংস ধর্মঘট সফল হতে পারে না। অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে, সমাজে শোষণ ও বঞ্চনা যেমন থাকবে, তেমন অহিংস ধর্মঘটও চলবে। গান্ধীজি বলেছেন— 'মালিকদের প্রতি আমার উপদেশ হল যে, যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেন, শ্রমিকরাই যে সেগুলির প্রকৃত মালিক এ কথা স্বেচ্ছাপূর্বক তারা মনে করুন। কেননা

কারখানার সম অংশীদার শ্রমিকরা।'

এ প্রসঙ্গে ফরাসি মনীষী রোমাঁ রোলাঁর মন্তব্যও যুক্ত করা বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে যে, গান্ধীর ধর্মঘট ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ভাবনা কতটা যুক্তিসঙ্গত: 'শ্রেণি বিরোধ ও শ্রমজীবীদের সংগ্রামের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি ..... যা লিখেছেন তা থেকে দেখা যাবে, পৃথিবীর রক্তক্ষয়ী পদযাত্রা যে নব পর্যায়ের পথে এগিয়ে গেছে সে সম্বন্ধে তিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনবহিত।'

গান্ধীজি ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত সচেতন ছিলেন না। তিনি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিষয়গত এমন এক আদর্শবাদের দর্শন প্রচার করেছেন, যা বস্তুগত ভাবে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। তিনি যে ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের অভিমুখ নির্দেশ করেছেন, তা কার্যত শ্রমিককে বহু ক্ষেত্রে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে এনেছে, কিন্তু পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় মালিকদের স্বেচ্ছাচারকে নিবৃত্ত করা যায়নি। শ্রমিকশ্রেণির অভীষ্ট পূরণে ধর্মঘটকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করার দৃষ্টিভঙ্গির তিনি বিরোধিতা করেছেন। তিনি মালিকদের অনুরোধ, উপরোধ করে ও হৃদয় পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষ উপলব্ধি করেছেন, গান্ধীজির ধর্মঘট সংক্রান্ত দর্শন কার্যত স্বপ্নময় ভাববাদের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'ধর্মঘটের' যে ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে, চিন্তা, ভাবনা ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ইউরোপের বা আমেরিকায় ধর্মঘটের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটেছে। ভারতীয় ধারণা ও বিদেশি ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। বিদেশে ধর্মঘটের স্বরূপ সম্পর্কে সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে ইংরেজ ভাষায় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ অভিধানে।

Encyclopaedia Britannica-তে বলা হয়েছে: 'Work stoppages resulting from serious disagreements between labour and management. Strike are collective refusals by employees to work under the conditions required by employers..... Strikes arise for

a number of a reasons; from disputes about wages and the conditions of employment; in sympathy with other striking workers; from jurisdiction disputes between two unions; or for purely political goals [as in the general strike q.v.] strikes not authorized by the central union body [wildcat strike], may be directed against the union leadership as well as the employer.

অক্সফোর্ড অভিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "a concerted refusal to work by employees till some grievances is remedied. So the word 'Strike' may be best defined as a sudden cessation of work resulting from an agreement on the part of a body of workmen either to break or not to renew their existing contract of service for the purpose of obtaining or resisting a change in the conditions of employment. So the strike is not a mere refusal to work, for such an act has never been made punishable by law, nor is it the abandonment of work begun, for the right to liquidate exists in the case of labour contracts just as in that of any other contract that is not for a fixed term. The strike is a means of constraint exercised by one contracting party over the other in order to obtain certain modicication of the contract. In the case of strike the condition consists in the sudden interruption of labour and injury which results for the employer. It should be noted, also, that though a strike may be accompanied by breaches of contract and intimidation and riot, yet such features as these, though common to many strikes, are excluded from the legal definition of the word strike."

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস 'মজুরি প্রথা' গ্রন্থে বলেছেন শ্রমিকশ্রেণির কাছে ধর্মঘট একটি অধিকার অর্জনের কৌশল ও মালিকের বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' একটি অস্ত্রও বটে। যার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণি তাঁদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারেন। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণিকে সংঘাতে যেতে হলে যে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন, তার জন্যে চাই সংহতি। প্রতিরোধ ব্যতীত কোনও দিনই শ্রমিক

তার ন্যায্য অধিকার অর্জন করতে পারে না। তাই সংগ্রাম হল শ্রমিকশ্রেণির একমাত্র মুক্তির পথ। শ্রমিক তার সার্বিক মুক্তির জন্যে তার উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হওয়া ছাড়া কোনও বিপন্ন পথ নেই। এই চেতনা শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এক দিনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে না।

লেনিন নিজের দেশের শ্রমজীবীদের সংগঠিত করতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের ক্ষেত্রে ধর্মঘটগুলির অথবা কাজ বন্ধের তাৎপর্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ধর্মঘটগুলিকে একটা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখা দরকার। আমরা দেখেছি, মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করে মজুরি নির্ধারিত হয়। একজন শ্রমিক যখন নিজেকে একক ভাবে অত্যন্ত অসহায় মনে করে, তখন শ্রমিকদের পক্ষে যুক্ত ভাবে সংগ্রাম করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। মালিক যাতে মজুরি হ্রাস করতে না পারে, অথবা যাতে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় তার জন্যই শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। এবং এটা ঘটনা যে প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিকদের ধর্মঘট করতেই হয়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রত্যেকটি দেশেই এবং সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকরা নিজেদের অসহায় মনে করে, যখন তারা বিচ্ছিন্ন থাকে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ ভাবেই তারা মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে— হয় ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে অথবা ধর্মঘটের হুমকি প্রদর্শন করে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় যখন অধিক সংখ্যায় বড় বড় কারখানা চালু হয় এবং বড় মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোট মালিকেরা দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তখন শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত জরুরি আকার ধারণ করে। কারণ, এই অবস্থায় বেকারি বৃদ্ধি পায়, পুঁজিপতিদের মধ্যে সস্তায় মাল উৎপাদনের (এবং সস্তায় উৎপাদনের জন্য তারা শ্রমিকদের মজুরি যথাসম্ভব কমিয়ে দেয়) প্রতিযোগিতা তীব্র হলে শিল্পজাত দ্রব্যের দামের ওঠানামা শুরু হয় ও সংকট তীব্র হয়। যখন শিল্পের প্রসার হয় তখন মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি পায় অথচ তারা সেই মুনাফার কোনও অংশ শ্রমিকদের দেওয়ার কথা চিন্তা করে না; কিন্তু যখন সংকট সৃষ্টি হয় তখন মালিকেরা ক্ষতির বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়...

এ ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকেই যে ধর্মঘটের উদ্ভব হয় সেই ধর্মঘটগুলিই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের সূচনা করে। একজন নিঃস্ব একক শ্রমিকের পক্ষে ধনবান পুঁজিপতিদের মুখোমুখি

হওয়ার অর্থই হচ্ছে চূড়ান্ত দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া। পুঁজিপতিদের কাছে কোনও সম্পদেরই কোনও মূল্য থাকে না যদি তাদের উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর উপর শ্রমিকেরা তাদের শ্রম প্রয়োগ করে নতুন সম্পদ সৃষ্টি না করে। পুঁজিপতিদের কাছে একজন একক শ্রমিক নিতান্ত ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই ক্রীতদাসের কাজই হবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধি করে যাওয়া। এর বিনিময়ে সে পাবে মাত্র এক টুকরো রুটি, অথচ সারা জীবন ধরে শ্রমিককে থাকতে হবে অনুগত এবং ভাড়াটে ভৃত্য হিসেবে। কিন্তু যখন শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাদের দাবি পেশ করবে এবং পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, একমাত্র তখনই তারা আর ক্রীতদাস থাকবে না— তারা মানুষ হিসাবে দাঁড়াতে পারবে, দাবি করতে পারবে। বলতে পারবে যে তাদের শ্রমের ফল দিয়ে একদল পরগাছার ধনবৃদ্ধি করা চলবে না; যারা শ্রম করছে তাদেরও মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে দিতে হবে। ক্রীতদাসেরা তখন নিজেরা প্রভু হওয়ার দাবি করতে পারবে। তারা দাবি করবে যে জমিদার ও পুঁজিপতিদের মর্জি অনুযায়ী তাদের জীবনের গতি নির্ধারিত হবে না। তাই ধর্মঘট সব সময়েই পুঁজিপতিদের মনে ভীতির সঞ্চার করে; কারণ, এর মধ্যে দিয়ে মালিকের আধিপত্য খর্ব হতে শুরু করে।

মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মঘটকে শ্রমিকশ্রেণির তাৎক্ষণিক ও অন্তিম লক্ষ্যসাধনের একটি শক্তিশালী এবং সংগ্রামী অস্ত্র হিসাবে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। এঙ্গেলস আরও পরিষ্কার করে বলতে চেয়েছেন যে ধর্মঘট হল 'School of War'। তিনি আরও মনে করতেন যে শ্রমিকশ্রেণির অধিকার অর্জন ও মুক্তির জন্য ধর্মঘটকেই বাধ্যতামূলক ও অপরিহার্য অস্ত্র হিসাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি লড়াই শেখার জন্যেও ধর্মঘটকে অত্যাবশ্যক বলেই মনে করতেন। কার্ল মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ধর্মঘটকে সংগ্রামের এবং শ্রমিকশ্রেণির সংহতির প্রশ্নে গুরুত্ব দিয়েছেন। যা দিয়ে শ্রমিকেরা তাঁদের লক্ষ্য অর্জনের, অধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।

ধর্মঘট বা স্ট্রাইকের উৎসের যে পটভূমিকা ভারতবর্ষের ধর্মঘটের ক্ষেত্রে দেখেছি, আন্তর্জাতিক ধর্মঘট আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা দেখি না। তার উৎসমুখের বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্নতর। পরবর্তীতে ভারতবর্ষের ধর্মঘটের ইতিহাস আন্তর্জাতিক ধর্মঘটের উৎসের ইতিহাসের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

শ্রমিক আন্দোলনের সূচনাপর্ব ও প্রথম ধর্মঘট

জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব থেকেই ভারতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট দেখা দিয়েছিল। শ্রমজীবী জনসাধারণ যে ভাবে সেই সময় শোষিত ও বঞ্চিত হতেন, সেই হৃদয়বিদারক অবস্থা কিছু কিছু শিক্ষক, মানবতাবাদী ও সমাজসেবী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এঁরা কেউ আন্দোলনকারী ছিলেন না বা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সম্পর্কে এঁদের কোনও ধারণাও ছিল না। কিন্তু সমাজসেবী ও শ্রমিক দরদি হিসেবে শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা এঁরা সরকারের নিকট ও সংবাদপত্রে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। সাময়িকপত্রের প্রকাশ করেছিলেন। শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশে নাইট স্কুল পরিচালনা করেছিলেন। এ সব ঘটনা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঘটেছিল।

বাংলাদেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৭৪ সালে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে শ্রমিকশ্রেণির বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সম্ভবত এই পত্রিকাটিই শ্রমিক স্বার্থে পরিচালিত দেশের প্রথম সংবাদপত্র। বোম্বাইয়ের নারায়ণ মেঘাজি লোখাণ্ডে 'দীনবন্ধু' নামে শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি সংবাদপত্র ১৮৯৮ সালে প্রকাশ করেন।

শ্রমিকদের জন্য প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় করেন, সে যুগে তা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বার্থের চিন্তার বাইরে। শশীপদই ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় প্রথম অগ্রণী ব্যক্তি। তিনি শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮৮০ সাল নাগাদ কলকাতার উপকণ্ঠে 'বরাহনগর ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৬ সালের ১ নভেম্বর তারই উদ্যোগে শ্রমিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যা ভারতের প্রথম শ্রমিক সমাবেশ বলে উল্লেখ করেছেন গোপাল ঘোষ (ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ. ৪৪)।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ ১৮৭৪ সালে 'ওয়ার্কিং মেন্স মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক ও অনুন্নত শ্রেণির মধ্যে ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদির প্রচার। এর মধ্যে অবশ্য শ্রমিকদের জীবন-জীবিকাগত সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে ও শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বরাহনগর চটকল শ্রমিকদের জন্য নৈশ স্কুল এবং সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। পরবর্তী সময়ে চটকলগুলি সেই নৈশ স্কুল ও সেভিংস ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শ্রেণিচেতনা ব্যতিরেকেই শশীপদ 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার মাধ্যমে গরিব ও শ্রমজীবীদের কল্যাণের নানা উপকরণের উদ্ভব করেছিলেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মসমাজের আর একজন প্রচারক পি সি মজুমদার ১৮৭২ সালে বোম্বাইতে শ্রমিক অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮টি নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। (সূত্র: ড. রাধাকমল মুখার্জি, দ্য ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস, পৃ. ৩৫২) বাংলায় এই উদ্যোগের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রেও বিভিন্ন মানবদরদি ও সমাজসেবীগণ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকদের সমস্যা জনসমক্ষে ও ব্রিটিশ সরকারের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরতে নারায়ণ মেঘাজি লোখাণ্ডের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ সালে তিনি 'বম্বে মিলহ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংগঠনের সভাপতি হন। অনেক গবেষক লোখাণ্ডেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণির প্রথম সংগঠক এবং বম্বে মিলহ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশনকে ভারতের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু 'বম্বে মিলহ্যাণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন' ট্রেড ইউনিয়ন বলতে যা বোঝায় তেমন কোনও সংগঠন ছিল না। একথা অনস্বীকার্য বোম্বাইয়ের সেই সময়ের পরিস্থিতিতে তিনিই ছিলেন

শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বম্বে হ্যাণ্ডমিলস অ্যাসোসিয়েশনকে এ দেশের ট্রেড ইউনিয়নের ভ্রূণাবস্থা বলে স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। (সূত্র: ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, সুকোমল সেন, পৃ. ৬৭)

শ্রমিকদের দুঃখ, দুর্দশা ও তাদের ওপর নির্যাতন আর বঞ্চনার প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবী সমাজের কিছু মানুষের সোচ্চার হওয়া, শ্রমিকদের আর্থিক ও কর্মক্ষেত্রের অবস্থার প্রতিবেদনসহ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রভাবে শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা এবং বোম্বাইয়ের এন এম লোখাণ্ডের ভূমিকার মধ্য দিয়ে তৎকালীন শ্রমিকশ্রেণির মুখপত্রদের মানবদরদি ও সমাজসেবী ভূমিকাই প্রধান ছিল। শ্রেণি সচেতন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর ভূমিকা তদানীন্তন পরিস্থিতিতে শশীপদ ও লোখাণ্ডের মধ্যে প্রত্যাশা করাও যুক্তিসঙ্গত হত না। ১৮৮৪ সালের ২৩ ও ২৬ সেপ্টেম্বর লোখাণ্ডের আহ্বানে শ্রমিকদের যে সভা হয় সেখানে নিম্নোক্ত দাবির ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করা হয়। ১৮৮৫ সালে মে দিবসের সংগ্রাম ও ধর্মঘটের আগে ভারতীয় শ্রমিকদের দাবিপত্রটি উল্লেখযোগ্য।

১. রবিবার প্রত্যেক শ্রমিককে সম্পূর্ণ ছুটি দেওয়া হোক।
২. প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হোক।
৩. কারখানার কাজ সকাল সাড়ে ছটায় শুরু করে সূর্যাস্তের সময় বন্ধ করা হোক।
৪. চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন প্রদান করতে হবে।
৫. কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও শ্রমিক আহত বা অক্ষম হয়ে পড়লে তার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত পুরো বেতন দিতে হবে এবং কোনও শ্রমিক যদি চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে পড়ে তবে তার জীবনধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

এই স্মারকলিপিতে ৫,৫০০ জন শ্রমিক স্বাক্ষর করেন এবং তা ১৮৮৪ সালে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের নিকট পেশ করা হয়।

১৮৯০ সালের ২৪ এপ্রিল লোখাণ্ডে যে সভা আহ্বান করেন সেই সভায় প্রায় দশ হাজার শ্রমিক শামিল হয়েছিলেন এবং সেই সভায় দুজন নারী

শ্রমিক বক্তব্য রাখেন। ওই সভায় সপ্তাহে একদিন ছুটির দাবিতে স্মারকলিপি প্রস্তুত তরা হয়। ১৮৯০ সালের ১০ জুন বোম্বাই মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সেই দাবি মঞ্জুর করলেও, বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি।

১৮৯৫ সালে বোম্বাইয়ের ফাদার হফকিন্স ও জে হেন্সন নামে দুই ব্যক্তি সিমেন্স ক্লাব নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই দুজন প্রতিষ্ঠাতা গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সেইলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনটি শ্রমিক-সমস্যা নিয়ে প্রচার চালাত। তবে এই সংগঠনটিও কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রথম যুগে (১৮৫০—১৯০০ সাল পর্যন্ত) শ্রমিকরা নিজস্ব দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে না-ওঠা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল।

প্রথম ধর্মঘট

ভারতে সংগঠিত শিল্পের প্রথম ধর্মঘট ১৮৬২ সালে। ধর্মঘটের ইতিহাসে সেই ধর্মঘট প্রথম নয়। ভারতে রেললাইন প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৩ সালে বোম্বাইতে। পরের বছর ১৮৫৪ সালে বাংলায় রেল লাইন স্থাপন হয়। শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশে দ্রুত রেলপথের বিস্তার ঘটতে থাকে। আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে রেলপথকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকশ্রেণির সংখ্যাও দ্রুত হারে বেড়ে চলে। রেলপথ প্রতিষ্ঠার মাত্র ৯ বছর পর হাওড়া স্টেশনের কর্মচারীরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন। একই বছরে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অডিট বিভাগের কর্মচারীরাও ধর্মঘটে শামিল হন।

কিন্তু ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাসে প্রথম ধর্মঘট ১৮২৭ সালে বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ পরিবেশে পাল্কি-বেয়ারাদের লাগাতার এক মাসের ধর্মঘট সমাজজীবনে ব্যাপক আলোড়ন তুলে দিল। পাল্কিতে যাঁরা যাতায়াত করতেন, সমাজের সেই উচ্চবর্ণের ও বিত্তবান মানুষেরা ভাবতেই পারেননি যে, নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পল্কি-বেয়ারারা এক মাসের বেশি ধর্মঘটে শামিল হবে। আর পাল্কি-বেয়ারাগণও ভাবতেও পারেনি যে, তারা ভারতে প্রথম ধর্মঘটের ইতিহাস সৃষ্টি করছে। (সূত্র: ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস, বাসুদেব মোশেল, পৃ. ২৩)

উনিশ শতকের বাংলাদেশে পাল্কি ছিল প্রধান গণ-পরিবহণ। একেবারে অতি সাধারণ মানুষ পাল্কিতে চড়ে যাতায়াত করতে পারত না, কারণ পাল্কির ভাড়া দেওয়ার মতো সামর্থ্য সকলের ছিল না। সাহেবরা ও কলকাতার বাবু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গই পাল্কি ব্যবহার করতেন। কলকাতার সর্বত্রই পাল্কি পাওয়া যেত এবং পাল্কি সব জায়গাতেই যাতায়াত করত। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাল্কির আড্ডা বা স্ট্যাণ্ড ছিল, এখন যেমন বাস স্ট্যাণ্ড আছে তেমনই। ব্যক্তিগত পাল্কি ছাড়াও সরকারি পোস্ট অফিসের নিয়ন্ত্রণেও পাল্কি চলাচলের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল। এই পাল্কিগুলিকে বলা হত ডাক-চৌকি। বেশি দূরত্বের পথে যাতায়াতের জন্য ডাক-চৌকি ছিল নির্ভরযোগ্য, ডাক-চৌকির সাহায্যেই দেশের বিত্তশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ দূরদেশে যাওয়া-আসা করতেন।

ডাক-চৌকির ভাড়া ছিল বর্তমান টাকার মূল্যমানের সঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে ট্রেনের প্রথম শ্রেণির ভাড়ার প্রায় সমতুল। পথের দূরত্ব এবং খাওয়া-দাওয়ার খরচপত্রসহ পাল্কির ভাড়া সেই সময়ে বাজারদরের পক্ষে বিলাসবহুল ছিল। ১৭৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত কলকাতা গেজেটের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি থেকে ডাক-চৌকির ভাড়ার হার জানা যায়। দূরত্ব অনুসারে ভাড়ার হার ঠিক করা হত। সুধীরকুমার মিত্র 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩) ভাড়ার একটি তালিকা দিয়েছেন। কলকাতা থেকে নিম্নে বর্ণিত স্থানে যাওয়ার জন্য কত টাকা ভাড়া লাগত সেটা জানা যায় এই তালিকা থেকে।

চন্দননগর	২৪ ॥·	মুরদাবাদ	১৫৯ ॥·
চুঁচুড়া	২৪ ॥·	রাজমহর	২৫৭ ॥·
হুগলি	৪৬ ।·	ভাগলপুর	৩৫৪ ॥·
বাঁশবেড়ে	৭৬ টাকা	মুঙ্গের	৪০৬ ॥·
বহরমপুর	১৫৯ ॥·	পটনা	৫৪০ টাকা
কালকাপুর	১৫৯ ॥·	বাঁকিপুর	৫৪০ টাকা
ময়দাপুর	১৫৯ ॥·	দানাপুর	৫৫৩ ॥·
কাশিমবাজার	১৫৯ ॥·	বক্সার	৬৬৪ টাকা
মুর্শিদাবাদ	১৫৯ ॥·	বেনারস	৭৬৪ টাকা

কলকাতার বাইরে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য ডাক-চৌকির যেমন নির্দিষ্ট ভাড়ার হার ছিল, সে রকম কলকাতার ভেতরে এক অঞ্চল থেকে

অন্য আর এক অঞ্চলে আসা-যাওয়ার জন্য পাল্কির ভাড়া নির্দিষ্ট ছিল। ১৭৯৪ সালে বেয়ারাদের মজুরি সে দিনের বাজারের মূল্যমানের তুলনায় মোটামুটি ভাল ছিল। পাঁচজন ঠিকে বেয়ারার এক দিনের মজুরি ছিল এক টাকা। অর্ধবেলার জন্য আট আনা। কলকাতার বাইরে পাঁচ মাইল পর্যন্ত যেতে পাল্কির ভাড়া চার আনা হিসেবে দিতে হত। এক ঘণ্টা পর্যন্ত সময়ের জন্য এক আনা ভাড়া যাত্রীদের দিতে হয়েছে। আজ এক আনা, দু'আনা কোনও হিসেবের মধ্যেই আসে না, কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে একজন দিন মজুরের সংসার সামান্য এক-দু কড়িতেই চলে যেত। সেই সময় দু-চার আনার বাজার মূল্য অনেক বেশিই ছিল। তৎকালীন বাজার দামের যে হিসেব পাওয়া যায়ে, তা বেশ আকর্ষণীয়। এই বাজার দর বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে একজন পাল্কি-বেয়ারার দৈনিক রোজগারের পরিপ্রেক্ষিতে বাজারের মূল্যস্তরের সঙ্গে শ্রমার্জিত মূল্যের পার্থক্য কতটা ছিল। বাজারের মূল্যমানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে পাল্কি-বেয়ারাদের রোজগার বিশেষ কিছু কম ছিল না। ১৮০০ সালে ভোগ্যপণ্যসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের বাজার দর প্রসঙ্গে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সেকালের বাজার দর' (দৈনিক বসুমতী: ১২ মার্চ ১৯৬৭) উল্লেখ করেছেন।

পণ্যদ্রব্য	পরিমাণ	বাজার দর
চাল	১ মণ	১ টাকা ১২ আনা
ডাল		৩ টাকা ১২ আনা
সরষের তেল		৩ টাকা ৪ আনা
ঘি		১৮ টাকা ২ আনা
নুন		২ টাকা ৮ আনা
ময়দা		২ টাকা ৮ আনা
মাখন		৩৬ টাকা
গুড়		১ টাকা ১৪ আনা
দুধ		১ টাকা ১৪ আনা
মাছ	"	২ টাকা ৮ আনা
মাংস		১০ টাকা
মুরগি	১০০টি	৭ টাকা ১৩ আনা
আলু	১ মণ	২ টাকা

পিঁয়াজ		১ টাকা
বেগুন	”	১৫ আনা
লাউ	১০০টি	১ টাকা ৯ আনা
কলা		৪ আনা
ডিম		১০ আনা
চিনি	১ মণ	৬ টাকা
বিস্কুট	১ পাউণ্ড	২ আনা
ইট	১,০০০	১ টাকা ১১ আনা
চুন	১ মণ	৬ আনা ৬ পয়সা
বাঁশ	১০০টি	১০ টাকা
রাজমিস্ত্রি	১ দিনের রোজ	৩ আনা
ধোপা	১০০ কাপড়	১ টাকা ৮ আনা
নাপিত	১ সপ্তাহে	২ আনা
মুটে	এক মোট	৪ আনা
নৌকা ভাড়া	শ্রীরামপুর থেকে কলকাতা	১ টাকা ৪ আনা

এই বাজার দরের তুলনায় একজন শ্রমিকের মোটামুটি জীবনধারণের মতো রোজগার ছিল। শ্রমজীবী মানুষকে অবশ্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। পাল্কি-বেয়ারাদেরও অত্যন্ত শারীরিক শ্রম করতে হত। স্বাধীন জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমই ছিল একমাত্র উপায়।

শ্রমজীবী জনসাধারণের রোজগার প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় 'রামমোহন রায় অন ইণ্ডিয়ান ইকনমি' (রেয়ার বুক পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, পৃ. ৬৪) গ্রন্থে। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার রাজা রামমোহনের নিকট ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। রামমোহন শ্রমজীবী মানুষের আয়ের যে তথ্য দিয়েছিলেন সেখান থেকেই শ্রমকারী মানুষের মজুরি বিন্যাসের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন— 'কলকাতার ছুতোর ও কামার ইত্যাদির মধ্যে ভাল কারিগররা... মাসে ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা মজুরি পায় (অর্থাৎ ২০ শিলিং থেকে ২৪ শিলিং), সাধারণ কারিগর যারা একটু নিম্নমানের কাজ করে তারা মাসে ৫ থেকে ৬ টাকা মজুরি পায় (অর্থাৎ প্রায় ১০ শিলিং), রাজমিস্ত্রিরা মাসে ৫ থেকে ৭ টাকা (অর্থাৎ ১০ শিলিং ১৫ শিলিং) পেয়ে থাকে। সাধারণ শ্রমিকরা

পায় মাসে সাড়ে ৩ টাকা থেকে ৪ টাকা, মালি বা জালকর্ষকরা পেয়ে থাকে মাসে ৪ টাকার মতো, আর পাল্কিবাহকেরা ওই রকম মজুরি পায়। ছোট ছোট শহরে এই মজুরির হার কম, গ্রামাঞ্চলে আরও কম।' শহর ও গ্রামে বরাবরই ছিল অসম অর্থনৈতিক কাঠামো। গ্রামীণ আর্থিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে শহরের পার্থক্য থাকার ফলে গ্রামের মানুষের রোজগার ছিল কম। শহরের মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল একটু বেশি। সেকালের বাজারদরের সঙ্গে পাল্কি-বেয়ারাদের রোজগার সঙ্গতিহীন ছিল না। আর্থিক অসঙ্গতির কারণে নিম্নমানের জীবনও তাদের যাপন করতে হয়নি। আজ থেকে ২০০ বছর আগে বাজারদর স্থিতিশীল ছিল, বহু বছর মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ছিল গ্রাম ও অঞ্চলভিত্তিক। উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ছিল ভোগের জন্য উৎপাদন।

বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন ছিল ভোগভিত্তিক, মুনাফার জন্য উৎপাদন হত না আর সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও ছিল সীমাবদ্ধ। পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘট আর্থিক কারণে বা ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে সংঘটিত হয়নি। পাল্কি-বেয়ারাদের মধ্যে জাতিগত-সম্প্রদায়গত ব্যবধান ছিল, জাতপাতের সমস্যা ছিল প্রতিদিনের বিষয়। পাল্কি-বেয়ারাগণ নিম্নবর্গের ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা এদের স্পর্শ পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন। বাড়ির মহিলারা যদি কখনও পাল্কিতে চড়তেন তাহলে পুনরায় বাড়ি ঢোকার পরে কাপড় পরিবর্তন করেই অন্দরমহলে প্রবেশ করতেন। পারিবারিক শুচিতা রক্ষার জন্য চন্দননগরের দেওয়ান রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রথম ওড়িশা থেকে গোপবংশীয় কয়েকজন পাল্কি-বেয়ারা নিয়ে আসেন। রাজা নবকৃষ্ণ দেব অনুরূপ ভাবে ওড়িশা থেকে পাল্কি-বেয়ারা নিয়ে এসেছিলেন। এ সব ছিল তাঁদের আভিজাত্যের প্রকাশ। জীবনধারণের জন্য আর্থিক সংকট ছিল না, জাতপাতের সমস্যাও ছিল, এ সব সত্ত্বেও পাল্কি-বেয়ারারা কেন ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছিলেন?

ধর্মঘটের প্রধান কারণ ছিল ১৮২৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের জারি করা নতুন এক নির্দেশ। পাল্কি-বেয়ারাদের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এই ফরমান বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। এই নির্দেশে বলা হয়েছিল:

১. প্রত্যেক পাল্কি-বেয়ারাকে পুলিশের খাতায় নাম লেখাতে হবে।
২. প্রত্যেক বেয়ারাকে পরতে হবে পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যা নির্দেশক

চাকতি, এটা বাধ্যতামূলক।

৩. ভাড়ার বিন্যাস করে ঘণ্টা অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ হল অর্থাৎ, ভাড়া বিন্যাসের নামে কার্যত মজুরি কমিয়ে দেওয়া হল।

এ দেশের মানুষকে শোষণ করার যে চক্রান্ত ব্রিটিশ সরকার করেছিল, সেই আক্রমণ নেমে এল বেয়ারাদের উপরে। এই আইনের মাধ্যমে যে কৌশলে পাল্কির ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হল, বেয়ারারা সেটা কিছুতেই মানতে পারেনি। জমতে থাকা ক্ষোভ অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্ষোভে পরিণত হয় এবং পরিণতি লাগাতার ধর্মঘট। ধর্মঘট শুরু হয় ১৮২৭ সালের ১২ মে।

আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, শিক্ষাবঞ্চিত অতি সাধারণ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পাল্কি-বেয়ারারা নিজেদের জাতপাতের সমস্যা দূরে সরিয়ে দিয়ে সচেতন হয়ে উঠে কলকাতা অচল করে দেয়। এ দেশে তখনও ব্রিটিশ শাসনের ভয়ঙ্কর দিকগুলি ফুটে ওঠেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে ভাবে ভারত থেকে ধনসম্পদ পাচার শুরু করেছিল, পরবর্তী কালে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের ঘাড়ে চেপে বসার পর শোষণ ও করের হার বাড়িয়ে ইংল্যাণ্ডে ধনসম্পদ প্রেরণ করেছে, তখনও সেটা ভারতীয়দের সম্যক উপলব্ধিতে আসেনি। ব্রিটিশ শাসনে এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের উপরে শোষণের পরোক্ষ মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই পাল্কি-বেয়ারাদের ধর্মঘট কার্যত এ দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে প্রস্তর ফলকের কাজ করেছে।

১৮২৭ সালে এ দেশে শ্রমিক সুহৃদ কোনও সংগঠন গড়ে ওঠেনি; ইংরেজের চালু করা আইনের প্রতিবাদে কোনও আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল না, সেই প্রেক্ষাপটে পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘট শুধু তাৎপর্যপূর্ণ নয়, ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৮২৭ সালে মে মাসে কলকাতার ময়দানে পাল্কি-বেয়ারাদের এক সমাবেশ ডাকা হয়। সেখান থেকেই সংঘবদ্ধ বিক্ষোভের ও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সমাবেশে অন্য পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবীরাও যোগ দিয়েছিলেন। এই সংগ্রামের তথ্য গোপাল ঘোষ— 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে (১৯৬৭, পৃ. ৫৪) লিপিবদ্ধ করেছেন। ময়দানের সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জনৈক পাঁচু সুর। এঁর পরিচয় বিস্তারিত জানা যায় না। পাল্কি-বেয়ারাদের তৎকালীন নেতা গঙ্গাহরি ছিলেন প্রধান বক্তা। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক ভাবনার ছাপ পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন:

'সরকারি নয়া নীতিতে তাদের ক্ষতিই স্বীকার করতে হবে। এই অন্যায় জুলুম কখনও মেনে নেওয়া যায় না। এ আঘাত শ্রমজীবী মানুষের রুজি-রোজগারের বিরুদ্ধে। ন্যায্য খাটুনির বিনিময়ে সরকার নতুন আইন করে পাল্কি-বেয়ারাদের মজুরি বেঁধে দিতে চেয়েছেন। আর গোটা মজুরির একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।' পাল্কি-বেয়ারাদের এই সভায় মাঝি, মাল্লা, গাড়োয়ানসহ বহু শ্রমজীবী মানুষেরাও উপস্থিত ছিলেন।

মাঝি মাল্লাদের নেতা তিনকড়ি সে দিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সভায় উপস্থিত সকলকেই উজ্জীবিত করেছিল। আগামী দিনে শ্রমিক আন্দোলনের সম্ভাবনার কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন সকলেরই আছে। শুধুমাত্র পাল্কি-বেয়ারাদের প্রয়োজন নয়, যারা শোষিত হচ্ছে, সেই সকল শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন তিনকড়ি। ১৮২৭ সালের মে মাসে, আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে এই ধরনের সুচিন্তিত বক্তব্য কল্পনাও কঠিন ছিল। ময়দানের সভাটি পাল্কি-বেয়ারাদের সমর্থনে অনুষ্ঠিত হলেও মাঝি-মাল্লাদের নেতা তিনকড়ির বক্তব্য সে দিন ভবিষ্যতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ। সে দিনের আন্দোলনকারী শ্রমজীবী মানুষেরা এখানেই থেমে থাকেননি, ময়দানে অনুষ্ঠিত সভা ছাড়াও সরকারের নতুন আইনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতিতে পাল্কি-বেয়ারাগণ গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার চিন্তাভাবনাও করেছেন। এলাকায় এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাল্কি-বেয়ারাদের ঐক্যবদ্ধ করা, এমনকী, মিছিল পর্যন্ত সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য পাল্কি-বেয়ারাদের মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়া, ধর্মঘটের মতো হাতিয়ার ব্যবহারের সাহস অর্জন করার মতো প্রস্তুতির কাজও আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ করেছেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেই হাজার হাজার পাল্কি-বেয়ারা লালবাজারের পুলিশ দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। কলকাতা শহরে পাল্কি-বেয়ারাদের বিক্ষোভ ধ্বনিত হতে থাকে। কলকাতাকে এক সময় মিছিলনগরী বলা হত, আজও অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কলকাতা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু কলকাতার মিছিলের

ইতিহাসে সংগঠিত বিক্ষোভ মিছিলের প্রথম নিদর্শন পাল্কি-বেয়ারাদের লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ। এখানেই থেকে থাকেননি আন্দোলনের নেতারা। তাঁরা আন্দোলন সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান বা সনদ রচনা করেছিলেন। এই সংবিধানে সংগঠনবিরোধী কাজের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারাও ছিল। তখন আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোনও সংগঠন সে ভাবে গড়ে ওঠেনি, ফলে সাংগঠনিক নিয়ম মানা বা না মানার প্রশ্ন উঠত না। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ধারা নিঃসন্দেহে মৌলিক ভাবনার পরিচয়।

পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটের সময় পথপ্রদর্শক কেউ ছিল না। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রথম যুগে কোনও নীতি, কোনও তত্ত্ব ও কোনও চেতনা কাজ করেনি। স্বতঃস্ফূর্ততার আবেগেই পাল্কি-বেয়ারারা নিজস্ব অধিকার রক্ষার্থেই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ভর আন্দোলন বহু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের কৌশলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু পাল্কি-বেয়ারাদের ধর্মঘট প্রকৃত অর্থেই কোনও আপসের পথে হাঁটেনি। আন্দোলনের রাস্তা বেছে নিয়েছে, যার পরিণতি ঘটেছে ধর্মঘটের মাধ্যমে।

পাল্কি-বেয়ারাদের ধর্মঘটের ইতিহাসই যত দূর যায় দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রথম ধর্মঘট। তার আগে লাগাতার কোনও ধর্মঘটের নজির নেই। সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোতে ইংরেজ পুলিশ ও সরকারি কর্তৃপক্ষকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ধর্মঘটে শামিল হওয়া, মিছিল ও সভা সংঘটিত করা, পুলিশ অফিসে ধরণা দেওয়া, সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা আদৌ সহজ কাজ ছিল না। সাহস ও চেতনার পরিচয় মেলে পাল্কি-বেয়ারাদের মানসিকতায়। আগামী দিনের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলার ভগীরথের ভূমিকায় সে দিনের শ্রমজীবী মানুষ পথে নেমেছিলেন।

সংবাদপত্রের পাতায় স্বতঃস্ফূর্ত এই ধর্মঘটের বিবরণ পাওয়া যায়—" Yesterday (21st instant) all the Theeka Bearers of Calcutta had formed themselves into a body and unaniously swore that they would not bear Palankeens until the new Regulation Promulgated for licencing them, be abolished, and that those who would disregard this agreement should be excommunicated from the community forfeiting their caste.

A little before twelve they had gathered together and gone directly to Police office urging against the Regulation referred to. The whole body consisting of about 1000 men being however expelled the Police office they afterwards resorted the meadow before the Supreme Court and raised laoud clamours.

'The further learn that they have drawn up on English Petition which they intend forthwith to Present to the Supreme Court.' (তথ্যসূত্র: John Bull, 1927 May-June, বাসুদেব মোশেল লিখিত ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত)

এই প্রতিবেন থেকেই বোঝা যায় পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটে ইংরেজ প্রশাসন ও সমাজের উচ্চবর্ণের বিত্তবান মানুষেরা কেন সে দিন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষের সংগঠিত শক্তির থেকে বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা সে দিন ধর্মঘট ভাঙার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

পাল্কি-বেয়ারাদের ধর্মঘট কমপক্ষে এক মাসের বেশি চলেছিল। সমাধানের কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। সভা, মিছিল, দরখাস্ত পেশ সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হয়নি ও সমস্যা মেটেনি। তার একটি অন্যতম কারণ ইংরেজ প্রশাসন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছিলেন। অনেক সংবাদপত্রের নৈতিক সমর্থন থাকলেও, কয়েকটি পত্রিকা ধর্মঘটের ন্যায্যতার বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। সমাচার দর্পণ পত্রিকাটি পাল্কি-বেয়ারাদের প্রতি সমর্থনের পরিবর্তে ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। কয়েকটি সংবাদপত্র শ্রেণিস্বার্থেই রাষ্ট্রশক্তির তোষামোদ করেছে মাত্র। বিশেষ করে, বিদেশিদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকাই ছিল ভারতীয়দের কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনার বিরোধিতা করা। বাংলা সংবাদপত্রগুলি শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রথম যুগে বিশেষ সমর্থন জানায়নি।

প্রথম যুগের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে অসফল হলেও, এই ধর্মঘটের বিশেষ কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য না থাকলেও, এই ধর্মঘট এক দিকে মানুষকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করেছে, অন্য দিকে শ্রমজীবী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে।

পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটের কিছুকাল পরেই একের পর এক ধর্মঘট সংঘটিত

হতে থাকে। গাড়োয়ান ধর্মঘট (১৮৫১), রজক ধর্মঘট (১৮৫৬), গোপ ধর্মঘট, ধাঙ্গড় ধর্মঘট, মাদ্রাজে মাংস বিক্রেতা ধর্মঘট, কলকাতায় মোট বাহকদের ধর্মঘট, জলভারীদের ধর্মঘট, তন্তুবায় ধর্মঘট, মালঙ্গী (লবণ শিল্পের কর্মচারী) ধর্মঘট, নাবিক ধর্মঘট (নৌকা ধর্মঘট), নমশূদ্র ধর্মঘট, তৎসহ ছাত্র ধর্মঘট ইত্যাদি লাগাতার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৬২ সালে প্রথম শিল্প ধর্মঘটের সূত্রপাত হল হাওড়া স্টেশনে রেল শ্রমিক ধর্মঘটের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র

ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস: বাসুদেব মোশেল, সুকোমল সেন: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, গোপাল ঘোষ: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট

গাড়োয়ান ধর্মঘট

১৮২৭ সালে সংঘটিত দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রথম ধর্মঘট পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি, কিন্তু ইতিহাসে পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘট এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। একমাস ব্যাপী এই ধর্মঘটের সপক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের সংহতি সমাবেশ সংগঠিত করা, প্রচারের কৌশল, আন্দোলনের মধ্যপথে ধর্মঘট থেকে সরে না যাওয়া, দৃঢ়তার সঙ্গে বিভিন্ন মানসিক চাপ উপেক্ষা করে এই ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের কাছে প্রেরণা ও মূল্যবান শিক্ষা।

১৮৫১ সালে গরুর গাড়ির চালক বা চলতি কথায় যাদের গাড়োয়ান বলা হয়, তাদের ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। গাড়োয়ান ধর্মঘটের গুরুত্ব পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘটের সঙ্গেই তুলনীয়। সেই সময় গরুর গাড়ি ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ। পাল্কি-বেয়ারারাই পাল্কি বহন করে নিয়ে যেত এবং যাত্রিসংখ্যা দু'জন, সঙ্গে খুব বেশি হলে একটি শিশু সওয়ার হতে পারত। কিন্তু গরুর গাড়িতে চারজনের বেশি যাত্রী স্বাচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে, সে কারণেই গরুর গাড়ি ছিল সে যুগের জনপরিবহণ। পারিবারিক যান বলতে গরুর গাড়িকেই

বলা হত। এমনকী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য গরুর গাড়িতেই অস্ত্র, গোলাবারুদ পাঠানো হয়েছিল। কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত পুরশ্রী পত্রিকায় (১১ নভেম্বর ১৯৭৮) পরিব্রাজক লিখিত 'কলকাতার গরুর গাড়ি' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়— বারুদ-বন্দুক, গুলি-গোলা সহ প্রত্যহ ২০০ সৈন্য সমর প্রাঙ্গণে গরুর গাড়ি করেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে উইলিয়াম উড সাহেবের আঁকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে গরুর গাড়িতেও অতিরিক্ত বহনের কারণে ঠাসাঠাসি করে যাত্রীরা যাচ্ছেন। উনিশ শতকে যানবাহন হিসাবে গরুর গাড়ি ছিল অপরিহার্য, সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের সর্বত্র। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে গাড়োয়ান ধর্মঘটে বাংলার সমাজজীবনে ব্যাপক আলোড়ন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। গাড়োয়ান ধর্মঘট শুরু হয়েছিল অনাবশ্যক কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে। বিদেশি শাসকদের পক্ষে তাদের রাজস্ব বাড়ানোর সহজ উপায় ছিল জনজীবনের সর্বস্তরে করের বোঝা চাপানো এবং সেই বর্ধিত কর আদায়ের জন্য অত্যাচারের পদ্ধতি গ্রহণ করা। গরুর গাড়ির উপরই কর চেপেছিল, শুধু তাই নয়, করের বোঝা চেপেছিল অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও। এমনকী যারা মাল খালাসের কাজে নিযুক্ত কুলি-মজুরদের রোজগারের উপরেও কর চাপানো হয়েছিল। এই কর ধার্যের বিজ্ঞপ্তি করা হয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশনের মাধ্যমে। সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল—

১. স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় গাড়ি— ২ টাকা

২. স্প্রিংওয়ালা ২ চাকার গাড়ি— ১ টাকা

৩. স্প্রিংওয়ালা নানা ধরনের দেশীয় শকট— ২ আনা

৪. স্প্রিং না-লাগানো নানা ধরনের ৪ চাকার গাড়ি— ৬ আনা

৫. স্প্রিং না-লাগানো ২ চাকার গাড়ি— ৪ আনা

৬. স্প্রিং না-লাগানো ২ চাকার ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লৌহ পত্রযুক্ত নানা প্রকার শকট— ৮ আনা

৭. ওই প্রকার কিন্তু যদ্যপি চাকার ও লৌহপত্রে বেষ্টিত ও পরিসর ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি থেকে কম হয়— ২ আনা

৮. মহিষ অথবা গরুর উপর ধার্য কর— ২ পয়সা

৯. হস্তির উপর ধার্য কর— ২ পয়সা

১০. উষ্ট্র— ৪ আনা

১১. ঘোটক— ১ আনা

১২. কুড়ি মেষ অথবা ছাগ— ৩ আনা

১৩. শত শূকর— ৪ আনা

১৪. খচ্চর— ১ পয়সা

১৫. গর্দভ— ২ পয়সা

১৬. বেয়াররাওয়ালা পাল্কি ৩ জন— ১ টাকা

১৭. পালনা নামক এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র পালবি— ৪ আনা

১৮. বেয়ারাওয়ালা ডুলি— ২ আনা

১৯. কোনও ব্যক্তি যদ্যপি ভাড়া লইয়া মোট বহে— ২ পয়সা

অপিচ যদ্যপি অন্য কোনও পশু দ্বারা যান বাহিত হয়, তবে তৎপ্রতিও উপরিউক্ত হারানুসারে কর বসিবেক (বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ১ম খণ্ড, ১৩৮৫, পৃ. ৭০)। উপরিউক্ত তালিকা অনুসারে আরোপিত কর সেই সময়ের টাকার মূল্যায়ন অনুযায়ী যথেষ্টই ছিল।

কর বৃদ্ধি ঘটল ১৮৫১ সালে। গরুর গাড়ির চালক-গাড়োয়ানেরা প্রথম বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ইংরেজ সরকারের চাপিয়ে দেওয়া কর নীতির প্রতিবাদে গাড়োয়ানরা ধর্মঘটের পথে পা বাড়ান। বলা চলে কর বৃদ্ধি করে সরকার বাধ্য করেছিল ধর্মঘট করতে। মহিষ বা গরুর গাড়ির উপর ধার্য কর ছিল ২ পয়সা, কিন্তু সেই সময় এক মণ চালের বাজার মূল্য ১ টাকা ১২ আনা মাত্র। সেই নিরিখে দৈনিক ২ পয়সা কর অনেকটাই। ধর্মঘটের ফলে মুখ্যত কলকাতা শহর অচল হয়ে গিয়েছিল এবং বণিক সমাজের উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কার্যত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল।

সরকার বিশেষ চেষ্টা করেও এই ধর্মঘট ভাঙতে পারেনি, ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার পিছু হঠতে শুরু করে। গাড়োয়ানদের দাবি মেনে নিয়ে বর্ধিত ২ পয়সা কর প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

ভারতে প্রথম ধর্মঘট ছিল আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে সংগঠিত পাল্কি-বেয়ারা ধর্মঘট। তার পরেই গাড়োয়ান ধর্মঘট। সেই সময় অসংগঠিত ও যথাযথ নেতৃত্বের অভাব সত্ত্বেও গাড়োয়ানদের দাবির কাছে সরকারের পিছু হটে যাওয়া নিঃসন্দেহে আন্দোলনের বড় সফলতা। কারণ, তৎকালীন শাসক ও শাসকদের অনুগামী সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী তথাকথিত ভদ্রলোকদের প্রবল বিরোধিতার মধ্যে আন্দোলনে

জয়লাভ প্রায় অসম্ভব ছিল। 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকা গাড়োয়ান ধর্মঘট সম্পর্কে লিখেছিল— 'মুটেরাও গাড়োয়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গভর্নর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা হয়, কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগের উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোনি বেহারা, গরু-গাড়োয়ান ইত্যাদি নিচ লোকেরা ঐক্য বাক্য আছে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা স্তান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি-ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এদেশে যখন গাড়িঘোড়া ছিল না, তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদের কর্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ি ঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এই ক্ষণ গাড়োয়ানদিগকে আশীর্বাদ করুন' (প্রাত্যক্ত, ৩য় খণ্ড, ১৯৬৪, পৃ. ২৮৫) পালন করে।

উপরিউক্ত প্রতিবেদন থেকে এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে এই ধর্মঘটে গাড়োয়ান ও মুটে-মজুররা ঐক্যবদ্ধ ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিবেদনে সেই সময়ের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

১৮৬২ সালে আরও একটি গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়েছিল। কিন্তু সেই ধর্মঘট কোনও আর্থিক কারণে হয়নি। ধর্মের নামে জীবিকা বিপন্ন করে তোলার প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে জীবসেবা আর শিবসেবা সমার্থক এই ধারণা সামনে রেখে সেই সময় গজিয়ে উঠেছিল 'পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভা'। এই সংগঠনের মাধ্যমে পশুক্লেশ নিবারণের নামে গরু ও মোষের প্রতি কষ্টকর ব্যবহার করার জন্য গাড়োয়ানদের প্রতি জরিমানা ও দুর্ব্যবহার করতে চেয়েছে। এই কাজে পুলিশ সাহায্য করেছে। পুলিশদের সাহায্যে জেল বা জরিমানা জারি করে গাড়ি টানা গরু ও মোষের প্রতি অত্যাচারের সমাধান সম্ভব নয়। আসলে এই জরিমানা জারি করার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি। ইংরেজ শাসকরা বরাবরই তাদের কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করে, কখনও প্রশাসনিক অত্যাচারের মাধ্যমে আবার কখনও ধর্মের নামে ভেদবুদ্ধির আবরণে শোষণ অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে।

৩ সেপ্টেম্বর থেকে এ বারের গাড়োয়ান ধর্মঘট শুরু হয়। কলকাতা নগরের সমস্ত গরুর গাড়ি চারদিন পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করে। সরকার এই

ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করে। এ ধর্মঘট স্থায়ী দাবি আদায়ে সক্ষম হয়নি।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে সংঘটিত এই ধর্মঘটগুলি পরবর্তী কালে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিল। সামাজিক ভাবে বঞ্চিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গাড়োয়ান ধর্মঘটের মাধ্যমে।

রজক (ধোপা) ধর্মঘট

সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক পূর্ববর্তী বছরে ১৮৫৬ সালে কলকাতায় রজক ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ধর্মঘটের কারণ ছিল একান্তই অর্থনৈতিক। রজক সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাপড় কাচা ও ধোয়ার পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। অর্থাৎ বাজারের মূল্যমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জামাকাপড় ধোয়া-কাচার মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে জীবনযাপনের খরচ বাড়তে থাকে, সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই মজুরি বৃদ্ধির দাবিও উঠতে থাকবে। কলকাতার রজক সম্প্রদায় নিজেদের বাঁচার অধিকারে সোচ্চার হলেন। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল কোনও সংগঠন না-থাকা সত্ত্বেও জীবন ও জীবিকার অধিকারের প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষেরা আন্দোলনের পথেই পা বাড়িয়ে ধর্মঘট সংঘটিত করেছেন। সেই সময় এঁদের সামনে না ছিল পূর্ব আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, না ছিল আন্দোলন-সচেতন নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি আন্দোলন পরিচালনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

কলকাতার কৃষ্ণবাগানের রজকেরা এগিয়ে এলেন কাপড় ধোয়া-কাচার মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে। তারা সমবেত হয়ে সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করলেন কাপড়-পিছু এক পয়সার মজুরি বৃদ্ধি করে দু'পয়সা করতে হবে। না হলে তাঁরা আর কাপড় কাচবেন না। ধর্মঘটই করবেন। উপস্থিত রজকেরা সকলেই একবাক্যে ধর্মঘটের প্রস্তাব সমর্থন করেন। দাবি না মানা পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যেতে রজকেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এখানেই তাঁরা থামলেন না। শহরের রজক সম্প্রদায়ের সকলকে সংগঠিত হওয়ার আবেদন জানালেন।

রজক সম্প্রদায়ের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা নেতৃত্ব যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই সময়ের রাজনৈতিক চেতনার মানদণ্ডে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা রজক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন,

'এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রি হইতেছে, মুটেরা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সেই স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ি দুই পয়সা না দিলে পাই না, পূর্বে টাকায় ছয় মন কাঠ বিক্রয় হইত, এখন তিন মনের অধিক দেয় না। এইরূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে, তবে আমরাই বা কী কারণে চিরকাল এক মূল্যে থাকিব। অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি, দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না।' (বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩)।

সাধারণ ভাবে সমাজে কোনও ব্যক্তিকে যদি একঘরে করা হয়, তা হলে সর্বাগ্রে তার ধোপা, নাপিত বন্ধ হয়। অর্থাৎ ধোপা বা রজক যদি সামাজিক পরিষেবার কাজ বন্ধ করে দেয়, তা হলে সমাজজীবনে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হয়। রজক ধর্মঘটের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারে বিশেষ সমস্যা দেখা দিল, এমনকী যারা নগদ পয়সায় জামাকাপড় ধোলাই করাতেন, তারাও বেশ বিপদে পড়লেন। রজক ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু রজকেরা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁরা জাত ব্যবসা ছেড়ে দেবেন, ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় পড়াতে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ নাগরিক সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের হুমকি ও চাপের কাছে নতিস্বীকারের পরিবর্তে পাল্টা হুমকি দিয়েছিলেন। সেই সময়ে সামাজিক নিয়ম-রীতি অনুসারে জাতিগত, সম্প্রদায়গত জীবিকা বংশপরম্পরা অনুসারে ধারাবাহিক ভাবে রক্ষিত হত। সুতরাং রজকের কাজ করতে পারে এমন বিকল্প কোনও জাতি বা সম্প্রদায় ছিল না। ফলে রজক ধর্মঘটে সামাজিক সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তথ্যের অভাবে জানা যায় না যে, কোন শর্তে, কীভাবে রজক ধর্মঘট প্রত্যাহার হয়।

ক্ষৌরকার (নাপিত) ধর্মঘট

ধোপা-নাপিত কথাটি যেমন এক সঙ্গে উচ্চারণ হয়ে থাকে, সে রকমই রজক (ধোপা) ধর্মঘটের পরেই সংগঠিত হয় ক্ষৌরকার ধর্মঘট। অতি সাধারণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের এই ধর্মঘট সামাজিক স্থিতাবস্থায় আঘাত করেছিল। সমাজে একজন ক্ষৌরকারের প্রয়োজন রজকের থেকেও বেশি। যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে নাপিতের

উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। আর যেহেতু সামাজিক বিন্যাস অনুসারে নাপিতের কাজ বংশগত পেশা, সে কারণে এই পেশায় বিকল্প কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষকে পাওয়া যাবে না। ফলে ক্ষৌরকার ধর্মঘট সংগঠিত হওয়ার পূর্বে কারও ধারণায় ছিল না সমাজে এই পেশার গুরুত্ব কত। এদের ধর্মঘট শুরু হওয়ার দু-চার দিনের মধ্যেই অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল।

ভারতীয় সমাজে বহুকাল ধরে জীবিকা বা পেশার সঙ্গে সম্প্রদায় ও বর্ণের সম্পর্ক অটুট। পেশাভিত্তিক ও বর্ণ বিভাজন হওয়ার ফলে নির্দিষ্ট কোনও পেশার মানুষের অন্য কোনও পেশাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। আর এই বংশগত জীবিকার সঙ্গে জাতিগত মর্যাদা যুক্ত থাকার ফলে পারিবারিক ধারাবাহিকতায় সকলেই একই পেশায় যুক্ত থেকেছেন। তা ছাড়া ভারতীয় সমাজজীবনের ধর্ম-ভাবনায় পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পরলোক ভাবনার প্রাধান্যের কারণে বর্ণগত পেশা কেউ ত্যাগ করতে চাননি। পারিবারিক পেশা ত্যাগ করে অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করলে তাকে জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত করে দেওয়া হত। প্রাচীনকাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দেশের মানুষ নিজেদের পরিচয় দিতেন 'প্রফেশনাল কাস্ট' হিসেবে। এ ভাবেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষা হত। কিন্তু ইংরেজ শাসনে 'ভারতে মনুষ্যত্ব নির্ভর ধর্মের পবিত্র ঐতিহ্যের ধারা হারিয়ে ফেলতে বসল তার ভারসাম্য আর চিন্তাধারা।' (অতুলকৃষ্ণ রায়, কলকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবম অধ্যায়, ১৯৮০, পৃ. ৭২)

ইংরেজ শাসকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আয়ের উৎস বাড়ানো এবং সে জন্য বৃত্তিকর ও লাইসেন্স ব্যবস্থাকে জোরদার করা। জাতিগত পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নাপিত, ধোপা, কসাই, মেথর প্রমুখের উপরে বৃত্তিকর ধার্য হয়েছিল। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের উপরেও করের বোঝা চাপানো হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে কর বৃদ্ধি করে নিজেদের শাসন, শোষণ সুরক্ষিত করেছে তার তথ্যপ্রমাণ সমৃদ্ধ ইতিহাস বিস্ময়কর। ১৮৫৬ সালের পৌরিকর বাবদ আদায় হয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। কলকাতায় বসবাসকারী নাগরিকদের উপর বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও জাতিগত, সম্প্রদায়গত পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর দিনের পর দিন কর চাপানো হয়েছিল। ভূমি-রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য করের হিসাব নিম্নরূপ:

বছর	রেটস ও ট্যাক্স-সহ অন্যান্য আদায়কৃত টাকা
১৮২১	২,৬৬,০০০
১৮৩৬	৩,৪৩,৩০০
১৮৫০	৩,৯৫,০০০
১৮৭৫	২১,৫৫,৫৬০
১৮৭৮	২৫,৪৩,২১৬
১৮৮১	২৬,৫০,২৫০

ইংরেজ শাসকরা এক দিকে যেমন ধারাবাহিক ভাবে করের বোঝা চাপিয়েছে অন্য দিকে সেই কর আদায়ের জন্য নির্মম প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। উপরিউক্ত হিসাব থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে কী হারে করের বোঝা চেপেছিল জনসাধারণের মাথায়। বর্ণ বা সম্প্রদায়গত পেশার ক্ষেত্রেও কর চাপানো হয়েছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করতে।

১৮৭৯ সালে ক্ষৌরকর্মীদের উপর বছরে ১২ টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধার্য করে প্রশাসন। ক্ষৌরকর্মীরা সংখ্যায় ছিল অনেক। প্রশাসনের নীতি ছিল যেহেতু এ দেশের মানুষ ধর্ম, সংস্কার, সামাজিক নিয়ম রীতি ইত্যাদির কারণে পেশার বা বৃত্তির পরিবর্তন করতে পারে না, সেহেতু কর ধার্য করলে পেশাগত নিরাপত্তার কারণেই সেই কর দিতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ ধার্য কর দিতে না পারলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বাধীন ক্ষৌরকর্ম বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সেই ভয়ে ক্ষৌরকর্মীদের ধার্য কর দিতেই হবে।

যে ভাবে ও যে পথে পাল্কি-বেয়ারা, গাড়োয়ান ও রজক সম্প্রদায় প্রতিবাদ ও ধর্মঘটের পা বাড়িয়েছিলেন সেই পথই অনুসরণ করলেন ক্ষৌরকার সমাজও। কলকাতায় গঙ্গার ধারে জগন্নাথ ঘাটে ক্ষৌরকর্মীরা এক সমাবেশে মিলিত হলেন। তারা দু'দফা দাবির সঙ্গে ১২ টাকা লাইসেন্স ফি রদ করার দাবি করলেন।

'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় ক্ষৌরকার ধর্মঘটের বিবরণ-সহ একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ আছে। পত্রিকা লিখেছিল— 'সেদিন জগন্নাথের ঘাটে নাপিতদের এক সভা হয়। সভাস্থলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে প্রতি মাথার চুল ছাঁটা এক আনা ও দাড়ি কামানো দু'পয়সা। এখন দু'পয়সা আর এক পয়সা আছে। শুনিলাম হিন্দুস্থানী নাপিত অনেক জুটিয়াছিল। এক

পয়সায় সর্বাঙ্গ কামাবে আর হাত-পা বেশ ঘণ্টাখানেক টিপিয়া দিবে। এক পয়সায় আর কত করিবে। তবে বাজার করা ও জল আনাটা বাকি থাকে কেন? যে রূপে দ্রব্যসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহারা ও কথা সহজেই বলিতে পারে। ইহার উপর উপযুক্ত লাইসেন্স ও ট্যাক্সের হাঙ্গামা। একজন নাপিতের দিন গুজরান হওয়াই ভার, তার উপর আবার প্রতিজনকে বৎসরে ১২ টাকা করিয়া ট্যাক্স! কতই বা রোজগার করে। আমরা যদি বলি যখন নাপিতেরা ধর্মঘট করিল তখন বাবুরাও ধর্মঘট করুন যে আমরাও আর দাড়ি কামাব না— ঘরে ঘরেই ও কাজটা সারিব।'

এই ধর্মঘটের পরিসমাপ্তি কীভাবে ঘটেছিল সে বিষয়ে প্রামাণ্য নথিপত্রের অভাব থাকায় বিশদ সংবাদ জানা যায় না।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাব ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাই শহরে তিন হাজার ক্ষৌরকার পেশা সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট সংগঠিত করেন (বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫)।

গোপ (গোয়ালা) ধর্মঘট: ইতোপূর্বে যে ধর্মঘটগুলি হয়েছে তার মুখ্য কারণ ছিল ইংরেজ শাসকদের অন্যায় অবিচারের বিরোধিতা, আর্থিক শোষণ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই আন্দোলনগুলির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটেছে তখন ধর্মঘটে রাজনৈতিক চেতনার অভাব, পূর্বাপর আন্দোলনের অনভিজ্ঞতা ও শিক্ষাসংক্রান্ত চর্চার অভাব, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন মানসিক সীমাবদ্ধতা ছিল তা সত্ত্বেও ভয়, ভীতি উপেক্ষা করে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যে ভাবে বিভিন্ন ধর্মঘটের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে সমগ্র দেশেই আন্দোলন সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে।

কিন্তু গোপ ও মোদক ধর্মঘট কোনও আর্থ-সামাজিক কারণ ছাড়াই ঘটেছিল। কলকাতার গোপ বা গোয়ালা সম্প্রদায় যারা দুধ ও ছানা সরবরাহ করতেন, আর মোদকগণ যারা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে যুক্ত তাদের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিবাদের কারণে উভয়পক্ষই ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। গোপ ধর্মঘটের ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন এই কারণে যে, আর্থ-সামাজিক কারণ ছাড়াও বিবাদমান দুই পক্ষই কেন ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছিলেন তা জেনে নেওয়া। ধর্মঘটের অভ্যন্তরীণ কারণের যে বিবরণ 'সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র' গ্রন্থে পাওয়া

যায়, তা হল— 'মোদকরা পূর্বে গোপদিগের নিকট হইতে গামছা বন্ধ ছানা ওজন করিয়া লইত তাহার জলাংশ বাদ দিত না, পরে তাহারা ছানার বন্ধন খুলিয়া তাহার মধ্যে ভাগ কাটিয়া জল বাদ দিয়া ওজন করণের নিয়ম করাতে গোপগণ বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ করিয়া একেবারে পরস্পর ঐক্য হইয়া ধর্মঘট করিয়াছে যে মোদকদিগকে ওইরূপ ছানা বিক্রয় করিবে না। এবং মোদকেরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জল বাদ না দিলে গোপদিগের ছানা ক্রয় করিবেন না।'

কলকাতার গোপ ও মোদকের ধর্মঘট বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছিল। দু'পক্ষই কমবেশি ক্ষতিস্বীকার করে উভয়পক্ষই ধর্মঘটে স্থিত ছিলেন। কিন্তু মুখ্যত আর্থ-সামাজিক কারণে বহু ধর্মঘটে শ্রমজীবী মানুষ সামিল হয়েছেন। যেমন ধাঙড় ধর্মঘট, মাদ্রাজের মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট, কলকাতার মোট বাহকদের ধর্মঘট ও জলভারীদের ধর্মঘট।

তাঁতি ধর্মঘট

ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই সামাজিক ভাঙাগড়ার শুরু হয়েছিল। এই দেশ যে ভাবে জাতি ও সম্প্রদায়গত বিভাজনে আবদ্ধ ছিল, ব্যক্তিগত জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে বংশগত জীবিকা ও কর্মপ্রক্রিয়া গ্রহণ করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল, সেই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করে। ইংরেজ শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বাংলার জনজীবনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। সে কারণেই জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধ্যবাধকতার গণ্ডি ভাঙা শুরু হয়। সমাজে বংশজাত কৌলিন্যের মর্যাদা ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে।

উনিশ শতকের শেষ ভাগেই কলকারখানার ও রেলপথের বিস্তারের মাধ্যমেই সমাজের ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে এই দেশের জনজীবনকে নির্দিষ্ট পুঁজিবাদী ধারায় বেঁধে ফেলতে শুরু করেছে। সামাজিক স্তরবিন্যাস ভ্রূণ আকারে হলেও শ্রেণিগত ভাবনার জন্ম দিতে থাকে। গ্রামীণ কৃষক পরিবার থেকে কলকারখানার কাজে যুক্ত হওয়ার ঝোঁক দেখা দেয়। এ দেশের চিরায়ত আর্থ-সমাজব্যবস্থা বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেতর থেকেই ভাঙতে শুরু করে। গত দুই শত বছর ধরেই চলছে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের এই পর্ব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আদর্শরূপেই (ক্লাসিক) পুঁজিবাদী

ধারার বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে এ কথা যেমন বলা যাবে না, তেমন সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এখনও ছড়িয়ে আছে সমাজজীবনে। কারণ, শিল্প বিপ্লবের আদর্শ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এখানে ঘটেনি।

ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের কারণে ব্যাপক ভাবে কলকারখানার প্রসারের ফলে উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল। উৎপাদন বৃদ্ধি শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদনে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার হতে থাকে। শুরু হয় নতুন নতুন উৎপাদন যন্ত্রের আবিষ্কার, অর্থাৎ মেশিন তৈরির মেশিন আবিষ্কার হতে থাকে। সে কারণেই ব্রিটিশ পুঁজির প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে পাওয়া, উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের জোগান। ব্রিটিশ পুঁজির প্রয়োজন ছিল সেই দেশ, যেখানে অঢেল কাঁচা মাল আছে অথচ দেশীয় উৎপাদন-পদ্ধতির অধিক বিকাশ ঘটেনি।

ব্রিটিশ পুঁজি প্রথমে ভারতবর্ষকে তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের বাজার হিসাবে গণ্য করতে থাকে। তার পরে কাঁচামালের জোগানদার দেশরূপেই গুরুত্ব দেয়। তার পর এই দেশেই কারখানা গড়ে তুলে দেশের শস্তা শ্রমিকের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য যেমন ভারতের অভ্যন্তরেও বিক্রি হতে থাকে, বিদেশেও রফতানি শুরু হয়। ভারতের কাঁচামাল ইংল্যাণ্ডে রফতানি ও পণ্য উৎপাদনের পর সেই পণ্য চড়া দামে পুনরায় ভারতের বাজারে আমদানি করা চলতে থাকে। ব্রিটিশ পুঁজি ফুলেফেঁপে ওঠে। পাশাপাশি ধ্বংস হতে থাকে ভারতের কুটির শিল্প, বিশেষ করে জগৎখ্যাত তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ধ্বংসসাধন খুব দ্রুত ঘটে যায়। দেশের উচ্চমানের তুলো থেকে সুতো তৈরি করে কাপড় নির্মাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাঁতিরা। ব্রিটিশ পুঁজি এ দেশের বংশগত কুটির শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক মূল কাঠামোই ভেঙে দেয়। ভারতীয় তাঁতিরাই হল ব্রিটিশ শোষণের নিপীড়নের প্রথম বলি। ব্রিটিশ পুঁজির বিকাশের জন্যই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকেই এ দেশের তন্তুবায় শ্রেণির মানুষকে নির্মম শোষণ করেই ইংরেজ বণিকরা একচেটিয়া মূলধন সংগ্রহ করেছিল।

এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যাবে সুধীরকুমার লিখিত 'হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' (১ম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃ. ১৪৩) গ্রন্থে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের বিবৃতি থেকেই শোষণের নিষ্ঠুর চিত্র ফুটে

ওঠে— 'আমরা যে অতুল ঐশ্বর্যলাভ করিয়াছি, উহা অত্যন্ত নৃশংস এবং ইতিহাসে বিরল অত্যাচার ও অনাচার করিয়া এবং ভারতের বুকে বসিয়া জোর করিয়া উহা আদায় করিয়াছি।'

ইংরেজ বণিকরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা সূত্রাকারে বলা যেতে পারে: ১. তাঁতিদের কাজের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া ২. উৎপাদনে দেরি হলে শারীরিক অত্যাচারের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো ৩. ইংরেজ বণিকদের ইচ্ছেমতো বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ ৪. বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে কাপড় দিতে বাধ্য করা ৫. জেল, জরিমানা ও মুচলেকা তো ছিলই।

এই ধরনের আর্থিক বঞ্চনা, শারীরিক নিগ্রহ ও ইংরেজ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য আরোপিত দাদন প্রথার বিভিন্ন বাধ্যবাধকতায় তন্তুবায় শ্রেণিকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। এই ধরনের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেই সংগঠিত হয়েছিল তন্তুবায় (তাঁতি) ধর্মঘট।

উনবিংশ শতকের আরও ধর্মঘট

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলার অসামান্য তাঁতশিল্পের কারিগরদের উপর যে ধরনের নির্মম শারীরিক অত্যাচার হয়েছে, তার উল্লেখ করেছেন বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক। হাউস অব লর্ডসে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বার্ক বলেছিলেন— 'কোম্পানির লোকেরা ভারতীয় শিল্পীদের হাতের আঙ্গুলগুলি এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে দড়ি জড়াইয়া বাঁধিত যে প্রত্যেকের হাতের মাংসগুলি একত্রিত হইয়া দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন ও সংবদ্ধ হইত। তৎপর উহারা কাষ্ঠের বা লোহার গোঁজ হাতুড়ি দ্বারা ওই সংবদ্ধ আঙ্গুলগুলির মধ্যে বিদ্ধ করিয়া দিত। নিষ্পেষিত হইয়া হাতগুলি এরূপ বিকলত্ব প্রাপ্ত হইত যে হতভাগ্য নিরীহ এবং শ্রমশীল তাঁতীর আর ইহজীবনে ওই হাত দ্বারা কোনও কিছু ধরিয়া মুখে তুলিতে সমর্থ হইত না। (সুপ্রকাশ রায়, ভারতে কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১৯৯০, পৃ. ৭৬-৭৭)।

একুশ শতকের ভারতবর্ষে এই ধরনের অত্যাচারের কথা কল্পনাও করা যায় না। কোনও মানুষের পক্ষেই এই উৎপীড়ন ও নিপীড়ন দীর্ঘকাল সহ্য করা অসম্ভব। ফলে বাধ্য হয়েই তন্তুবায় সম্প্রদায় প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। তাঁতিরা অসহযোগ ও ধর্মঘটের পথেই পা বাড়ায়। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের নদিয়া জেলার শান্তিপুরের তাঁতিদের সংঘবদ্ধ গণ আন্দোলন ও ধর্মঘট এক নতুন পথের দিশা দেখায়। জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে ওঠার কারণে তাঁতিরা গোপনে ব্যবসা চালিয়ে

যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু ইংরেজ বণিকরা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন শুরু করে। এর পরে খুবই সঙ্গত ভাবেই তাঁতিরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের রাস্তায় নেমে পড়ে। একটি জমায়েতের সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করে। সভা শুরুর পূর্বে তারা শঙ্খধ্বনি দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হয়। এই গোপন সমাবেশ থেকেই তারা আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

তাঁতি ধর্মঘট ভবিষ্যৎ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শুধু প্রেরণা ছিল না, বস্তুগত দিক থেকেও ধাপে ধাপে আন্দোলনকে উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়েছে। এই ধর্মঘটের প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা। এমনকী মিছিল করে কলকাতায় যাওয়া সেই যুগে নিশ্চয়ই অভিনব। সংগ্রামী কৌশলের পরিচয়। অথচ তাঁতি ধর্মঘটের পুরোভাগে অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া নেতৃত্ব ছিল না। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তাঁতশিল্পের উপর আরোপিত শর্তাবলি তাঁতিরা অস্বীকার করার সাহস প্রদর্শন করে। তাঁতিদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে ইংরেজ বণিকদের কৌশলগুলি ব্যর্থ হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে বাংলাদেশের নদিয়া ও হুগলি জেলার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন দুনিরাম পাল, নয়ন নন্দী, লোচন দালাল, রাম দাস প্রমুখ। আরও অনেকেই পুরোভাগে ছিলেন, কিন্তু সেই নেতৃত্বের বিশদ পরিচয় জানা যায় না। '১৭৭৯ সালে হুগলি জেলার হরিপাল কেন্দ্রের অধীন দ্বারহাট্টা শাখা কেন্দ্রের অধীন তাঁতীরা এলাকার 'রেসিডেন্ট'কে স্পষ্ট ভাবে জানাইয়াছিল যে তাহারা কোম্পানির জন্য আর বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিবেন না। রেসিডেন্ট বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই সংকল্প ও ঐক্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই' (প্রাগুক্ত)। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে অসহযোগ ও ধর্মঘটের মাধ্যমে। বাংলার তাঁতিদের উৎপাদন-যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া ও ধর্মঘটে সামিল হওয়া নিঃসন্দেহে সেই সময়ের বিচারে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যদিও তন্তুবায় আন্দোলন ও ধর্মঘট সফল করতে যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তার মূল্যায়ন সঠিক ভাবে হয়নি।

লবণ শিল্পে ধর্মঘট বা মালঙ্গী ধর্মঘট

কোনও খাদ্যই সুখাদ্য হয় না যদি পরিমিত লবণ না দেওয়া হয়। অতিরিক্ত

লবণে যে কোনও খাদ্য বিস্বাদ হয়ে ওঠে আবার লবণ কম হলেও খাদ্য সুস্বাদু হয় না। ভারতে রন্ধনপ্রণালীতে লবণের ব্যবহার বহুদিনের। বাংলাদেশের মেদিনীপুরে সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকায় উৎকৃষ্টমানের লবণ তৈরি হত। গ্রামের কৃষকরাই কৃষিকর্মের পাশাপাশি লবণ উৎপাদন করত। সমুদ্র-তীরবর্তী এলাকায় সমুদ্রের লবণাক্ত জল শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হত। লবণ শিল্প হয়ে উঠেছিল দেশের কুটির শিল্পের অন্যতম অর্থনীতিতেও লবণের ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সেই সময় লবণ শিল্পে উৎপাদনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের মালঙ্গী বলা হত।

ইংরেজ বণিকদের অন্যায় অবিচার আর শোষণের মাধ্যমে মালঙ্গীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কোনও রকম কর না দিয়ে অবাধ লবণ ব্যবসার একচেটিয়া সুবিধা লাভ করে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী। এই বণিক গোষ্ঠী ক্রমাগত লাভের লোভে মালঙ্গীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। কোম্পানির কর্মচারীগণ ১৭৬৫ সালে 'ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সুবিধাভোগী বণিকসভা গঠন করেন। এই বণিকসভা লবণ-ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। প্রধান শর্তটি হচ্ছে লবণ উৎপাদনকারীগণ সরাসরি দেশি মহাজনদের নিকট লবণ বিক্রি করতে পারবে না। প্রতি পাঁচ শত মণ লবণ তারা ৫ টাকা হিসেবে ইংরেজ বণিকদের নিকট বিক্রি করবে। সেই লবণ দেশি মহাজনদের ৫ টাকা মূল্যে বণিকদের থেকে কিনতে হবে। এই মহাজনরাই পুনরায় লাভ-লোকসান হিসেব করে সাধারণ মানুষের কাছে সেই লবণ বিক্রি করবে। লবণ যারা প্রস্তুত করে মহাজনরা তাদের থেকে সরাসরি কিনতে পারবে না। মালঙ্গীদের বাধ্য করা হয়েছিল ইংরেজ বণিকদের নিকট মুচলেকা দিতে। এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ভেরেনাস্ট (এ ন্যারেটিভ অব দ্য ট্রানজাকশন ইন বেঙ্গল, পৃ. ২৮)। কোম্পানির বণিকদের সঙ্গে দেশি মহাজনদের যে বোঝাপড়া হয়েছিল, তার পশ্চাতে আছে অন্য কাহিনি। ভেরেনাস্ট আরও বলেছেন—'কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীগণই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী হিসাবে দেশীয় মহাজনের দ্বারা লবণের ব্যবসা চালাতে থাকে।' কার্যত লবণ ব্যবসায়ে মুনাফার লোভেই কোম্পানির বণিকরা বেনামে ব্যবসা চালাত। আবার বেনামে ব্যবসা চালানোর বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লণ্ডনের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশ কিছু বিধিনিষেধও আসতে থাকে।

কিন্তু বিধিনিষেধ আরোপ করেও এ দেশে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত মুনাফার পথ থেকে সরিয়ে আনা যায়নি। বরং ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন ধরনের কৌশল ইংরেজ কর্মচারীরা উদ্ভাবন করেন। তারা লণ্ডনের কর্তাব্যক্তিদের প্রস্তাব দিলেন, যত লবণ বিক্রি হবে তার ৩৫ শতাংশ টাকা মাশুল হিসাবে কোম্পানিকে দেওয়া হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই প্রস্তাবের বিনিময়ে এ দেশে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বেআইনি ব্যবসা আইনি করে দিলেন এবং লবণ মাশুল বাবদ লক্ষ টাকা কোম্পানির ঘরে ঢুকল। ১৭৬৬ সালে একমাত্র লবণের মাশুল বাবদ কোম্পানির ১৩ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল। ক্রমাগত লবণ শিল্প থেকে কোম্পানির প্রচুর অর্থ রোজগার হতে থাকে। আরও বেশি লাভের লোভে ১৭৮৯ সালের ৩ জুন কোম্পানির পক্ষ থেকে মালঙ্গীদের লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ জারি করা হয়। এই আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে যেমন রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই লবণের দামও অসম্ভব বেড়ে যায়। চালের দামের চেয়ে লবণের দাম ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সাধারণ মানুষ লবণের ব্যবহার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। লবণের উপর মাশুল বৃদ্ধি হওয়ার কারণেই লবণের দাম এ ভাবে বেড়ে যায়।

লবণের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি হল ঠিকই, কিন্তু লবণ উৎপাদকদের আর্থিক অভাব-অনটনের কোনও সুরাহা হল না। কোম্পানির তহবিল যত ফুলেফেঁপে উঠেছে, এ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন ততই দুর্বিষহ হয়েছে। বিশেষ করে, তমলুক ও হিজলি অঞ্চলে লবণ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার চরমে ওঠে। দৈনিক মজুরি যা পেত তা দিয়ে সংসার প্রতিপালন সম্ভব ছিল না। বেশি পরিমাণে নুন উৎপাদনে মালঙ্গীদের বাধ্য করা হয়েছিল। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মালঙ্গীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েও রেহাই পাননি। কোনও মালঙ্গী পালিয়ে গেলে লবণ-ব্যবসার ইজারাদাররা ফৌজদার ও পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাদের খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে এসে পুনরায় লবণ উৎপাদনে লাগাত।

১৮২৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায় যে, 'হিজলী ও তমলুকের নিমক মহালে ১৩,৩৮৮ পরিজন সমেত 'আলেজারা' (যাদের লবণের কারখানায় বেগার খাটানো হত) মালঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন বৎসরাবধি ক্লেশ পাইতেছে।' ইজারাদারদের

অত্যাচার অসহ্য হয়ে ওঠায় মালঙ্গীরা দলে দলে কারখানায় অনুপস্থিত থেকেছে। ১৭৯৩ সাল থেকেই মেদিনীপুরের নিমক মহালের মালঙ্গীরা জমিদার ও পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ হয়ে কারখানার কাজ বন্ধ করে পালিয়ে যায়। এই মালঙ্গীরা পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেনি বরং নিমক মহালের সর্বত্র কোম্পানির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মালঙ্গীদের সংঘবদ্ধ করতে থাকে। এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে মেদিনীপুর সহ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মালঙ্গীরা ১৮০০ সালের এপ্রিল মাসে নিমক মহালের বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে এক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়ে কাঁথি পর্যন্ত মিছিল করে। একটি দাবি সনদও তৈরি করে তারা কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করে। তাদের দাবি ছিল, বাজারে উচ্চমূল্যে লবণের বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে হবে এবং বেগার ও ভেট প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। এই সময় মালঙ্গী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জনৈক বলাই কুণ্ডু। তারই অনুপ্রেরণা মালঙ্গীদের সংগঠিত হতে সাহায্য করে। কোম্পানির নিকট আবেদন করা সত্ত্বেও যখন কোনও সুরাহা হল না, তখনই তারা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মালঙ্গী আন্দোলনের প্রস্তুতি বহু দিন ধরেই চলছিল। এই আন্দোলন সরাসরি কোম্পানির অর্থনীতিকেই আঘাত করে। ১৭৮০ সালে লবণ শিল্প থেকে কোম্পানির রাজস্ব বাবদ আয় হয়েছিল ৪০,০০,০০০ টাকা, তিরিশ বছর পর ১৮১০ সালে রাজস্ব বেড়ে হয় ১১৭,২৫,৭০০ টাকা, আর উনিশ বছর পর ১৮২৯ সালে সেই রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫৮,২০,০০০ টাকা। এই বিশাল পরিমাণ রাজস্ব আদায় বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল মালঙ্গী ধর্মঘটের কারণে। ১৮০৪ সালে মালঙ্গীরা কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সময় মালঙ্গী ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিতে থাকেন প্রেমানন্দ সরকার নামে এক ব্যক্তি। কারখানায় কারখানায় ঘুরে এই প্রেমানন্দই ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবি আদায়ের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন। মালঙ্গীরা এই ধর্মঘটের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছিলেন। এই ধর্মঘট গ্রামেগঞ্জের মানুষেরও সমর্থন পেয়েছিল। দলে দলে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে মালঙ্গীরা। জমিদার, ইজারাদার ও কোম্পানি তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। মালঙ্গী ধর্মঘট নিঃসন্দেহে আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস।

লবণ শিল্প সেই সময় দেশের কুটির শিল্পসমুহের অন্যতম ছিল।

কারখানাভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়েছিল। সেই হিসাবে মালঙ্গী ধর্মঘটই দেশের প্রথম কুটির শিল্পের কারিগরদের ধর্মঘট। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কোম্পানির শাসন, জমিদার ও ইজারাদারদের রক্তচক্ষু আর পুলিশের অত্যাচার উপেক্ষা করে দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে মালঙ্গী ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল। এই ধর্মঘটের ইতিহাস কার্যত গণ আন্দোলনের ভ্রূণাবস্থার ইতিহাস। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ১৮৭২ সাল থেকে যে ধর্মঘটগুলি সংগঠিত হয়েছিল, সেখান থেকেই ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল।

মাঝি-মাল্লা ধর্মঘট

নদীমাতৃক ভারতে সভ্যতা বিকাশে অন্যতম প্রধান ভূমিকা জলপথ পরিবহণের। দেশের অভ্যন্তরে শুধু নয়, প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জলপথ পরিবহণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। দেশ-দেশান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে যাতায়াতের অন্যতম বাহন ছিল নৌ-পরিবহণ। এখনও জনজীবনে নদীপথ পরিবহণ অপরিহার্য। তা ছাড়া স্থলপথের চেয়ে জলপথে পরিবহণ খরচ তুলনামূলক কম। ইতিহাসে দেখা যায়, নৌযুদ্ধ বহু যুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা। বাণিজক্ষেত্র থেকে যুদ্ধক্ষেত্র নৌকা ছিল অপরিহার্য। ধনপতি সদাগর সিংহল যাত্রা করেছিলেন ময়ূরপঙ্খী নৌকায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের উদ্দেশে নৌকাযোগে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। নৌকার মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলেই গাঙ্গেয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। উল্লেখযোগ্য জনপদগুলি গড়ে উঠেছিল নৌকার মাধ্যমে যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণে। রানি রাসমণির কাশী যাওয়ার জন্য শত নৌকা সারি সারি সাজানো হয়েছিল।

ইংরেজ আমলে নদীপথে যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করত পুলিশ বিভাগ। দূর দেশে যাতায়াত করতে হলে পুলিশ বিভাগের অনুমতি প্রয়োজন হত। পুলিশ বিভাগের নৌকায় যাতায়াত করতে হলে নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হত। সেই ভাড়া পুলিশ কর্তৃপক্ষই স্থির করে দিয়েছিল। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ১৩৮৫, পৃ. ৩৪৬) বিনয় ঘোষ উল্লেখ করেছেন, নদীপথে যাতায়াতের জন্য পুলিশ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা। ১৭৮১ সালের ১০ মার্চ পুলিশের বিজ্ঞাপনে নদীপথে কলকাতা থেকে ভাড়ার একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। ভাড়ার হার ছিল নিম্নরূপ:

কলকাতা থেকে	যাতায়াতের সময়	কোন ধরনের নৌকা/ নৌকার প্রকারভেদ	ভাড়া
বহরমপুর	২০ দিন	৮ দাঁড়	২ টাকা
মুর্শিদাবাদ	২৫ দিন	১০ দাঁড়	২ টাকা
কানপুর	৯০ দিন	২০ দাঁড়	৭ টাকা
মুঙ্গের	৪৫ দিন	১৪ দাঁড়	৫ টাকা
পাটনা	৬০ দিন	২৬ দাঁড়	৬ টাকা
ঢাকা	৩৭ দিন	১৫০ মণ	২৯ টাকা
চট্টগ্রাম	৬০ দিন	৪০০ মণ	৪০ টাকা

এই ভাড়া ও মাশুল ছিল সরকারি হারে। কিন্তু সরকারি বা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও নৌকায় জনপরিবহণ ও মালপত্র পাঠানোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। সে কারণে নৌকায় মাঝি-মাল্লার ও খালাসির কাজ করে জীবিকানির্বাহ করতেন বহু মানুষ। এরা সকলেই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ ছিলেন। কলকাতা পুলিশের নির্ধারিত ভাড়ার হার কার্যকর হয়েছিল গঙ্গা নদী দিয়ে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে। নদীপথ পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন বিপন্ন করে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বান-বন্যা উপেক্ষার মধ্য দিয়েই পরিবহণের কাজে যুক্ত থেকেছেন, কিন্তু আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। গঙ্গায় হাজার হাজার ডিঙি নৌকা চলত, আমদানি-রফতানি ব্যবসার বিকাশ ঘটেছিল ডিঙি নৌকার ব্যবহারে। তা ছাড়া গঙ্গা পারাপারের জন্য ফেরি নৌকাই ছিল একমাত্র বাহন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ যুক্ত ছিলেন নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থায়।

মাঝি-মাল্লা ও খালাসিদের জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে কোনও দিন দেশের শাসকরা হস্তক্ষেপ করেনি। সামাজিক কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের কারণে এই দেশে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা অত্যাচারিত হয়েছেন, কিন্তু তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সমস্যা দেখা দিল কোম্পানির শাসনে। ইংরেজ সরকারের আর্থিক নীতি ছিল ঔপনিবেশিক দেশের জনসাধারণের জীবিকার উপরে করের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের রাজস্ব বৃদ্ধি করা। যে কোনও পদ্ধতিতে কর আদায় করার কৌশলে ইংরেজরা পারদর্শী ছিল। নৌকার মাঝি-মাল্লাদের অতি সামান্য রোজগারের উপর কর আরোপ করার ফলে তারা রেহাই পায়নি করের উৎপীড়ন থেকে। পাশাপাশি

মাঝি-মাল্লারাও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলেন, নৌকা না চালিয়ে পা বাড়ালেন ধর্মঘটের পথে। ১৮৫৬ সালের ২ ডিসেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা লিখেছিল— 'হাবড়ায় একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে। সাধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।' এই প্রতিবেদন থেকেই অনুধাবন করা যায়, নৌকা চলাচল বন্ধ হওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

উনিশ শতকের ধর্মঘটগুলি বহু ক্ষেত্রেই দাবি পূরণে সক্ষম হয়নি, কিন্তু জীবনজীবিকায় আক্রান্ত হয়ে পড়লে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পথে সামিল হয়েছেন। রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করে যে ধর্মঘটগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মঘটের ইতিহাসে সেগুলিকে মাইলস্টোন বলা যেতেই পারে।

শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক ও অধিকার সংক্রান্ত দাবির ভিত্তিতে উনিশ শতকে অনেক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। এই ধর্মঘটগুলির সঠিক তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাওয়া যায় না। দেড়শত-দুই শত বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ধর্মঘটগুলির তথ্য আজ সংগ্রহ করাও বিশেষ কঠিন। আরও যে সব ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য, তা হল ধাঙড় ধর্মঘট, মাদ্রাজের মাংস বিক্রেতাদের ধর্মঘট, কলকাতার মোটবাহক ধর্মঘট।

উল্লেখযোগ্য আরও একটি ঘটনা হল, গোপ ধর্মঘট। শ্রমজীবী মানুষের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে এই ধর্মঘট সংগঠিত হয়নি। দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণে কলকাতায় গোপ ও মোদকদের ধর্মঘট হয়েছিল। গোপ সম্প্রদায়, যারা মিষ্টির দোকানে ছানা সরবরাহ করত আর মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক-গোষ্ঠী, যাদের মোদক বলা হয়, তাদের ঘরোয়া বিবাদের পরিণতিতে দুই পক্ষই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ (৩য় খণ্ড, ১৯৫৪, পৃ. ৫৩) ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন— 'মোদকেরা পূর্বে গোপদিগের নিকট হইতে গামছা বন্ধ ছানা ওজন করিয়া লইত তাহার জলাংশ বাদ দিত না, পরে তাহারা ছানার বন্ধন খুলিয়া তাহার মধ্যে ভাগ কাটিয়া জল বাদ দিয়া ওজন করণের নিয়ম করাতে গোপগণ বিলক্ষণ ক্ষতি বোধ করিয়া একেবারে পরস্পর ঐক্য হইয়া ধর্মঘট করিয়াছে যে মোদকদিগাকে ঐ রূপ ছানা বিক্রয় করিবেক না। এবং মোদকেরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জল বাদ না দিলে গোপদিগের ছানা ক্রয় করিবেক না।' এই ধর্মঘটে দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও ধর্মঘট চালিয়ে গিয়েছিলেন। সিপাহি

বিদ্রোহের কিছু পূর্বে এই ধর্মঘট হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।

নমশূদ্র ধর্মঘট

আরও একটি ধর্মঘটের উল্লেখ করা যেতে পারে, যে ধর্মঘট অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরাই সংগঠিত করেছিলেন, কিন্তু শ্রমজীবীদের আর্থিক দাবি নির্ভর ছিল না। সম্প্রদায়গত অধিকার রক্ষার্থে ১৮৭৩ সালে ঘটেছিল নমশূদ্র ধর্মঘট। অভিনব এই ধর্মঘট নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয় হতে পারে। উনিশ শতকের বাংলাদেশে জাতি ও সম্প্রদায় ও বর্ণভিত্তিক সমাজ কাঠামোর মূলেই আঘাত করেছিল এই ধর্মঘট।

বাংলাদেশে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার নগ্নরূপ সব থেকে বেশি মাত্রায় দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকে। তা শুধুমাত্র বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা অতি গভীরে প্রবেশ করায় এ দেশে বিভিন্ন জাতির জীবন ও জীবিকা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে। জন্মগত বা বর্ণগত সমাজ বিভাজনকেই চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেওয়াই ছিল উনিশ শতকে সমাজ কাঠামোর ভিত্তি। ক্ষমতা থাকলেও অন্ত্যজ শ্রেণির সাধারণ মানুষের ছিল না সম্পদ সংগ্রহের অধিকার। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের একই অপরাধের বিচারে সামাজিক দণ্ডবিধিরও তারতম্য ছিল। ব্রাহ্মণের গুরুপাপে লঘুদণ্ড আর শূদ্রের লঘু পাপে গুরুদণ্ড। এই বিভেদ-নীতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায় মেনে নেয় না। জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছে সামাজিক ভাবে নির্যাতিতরা। রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময় থেকেই বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন নবজন্মের সঙ্গে যুক্ত ইউরোপীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় উনিশ শতকের সামাজিক বিবর্তনের ধারায়, তা হল ওই শতকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদের বিকাশের অঙ্কুর ইত্যাদি বর্ণভেদ প্রথার ক্ষেত্রে শিথিলতা নিয়ে আসে। সমাজকাঠামো যত শিথিল হয়, গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাও ভাঙতে শুরু করে। নিম্নবর্ণের অনেকেই ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় দ্রুত সম্প্রসারণশীল কলকাতায় আসতে থাকে। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় নতুন ভাবনা-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তার ফলে নতুন ও পুরাতন

আদর্শের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফলে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক বর্ণভেদের অবসানের দাবি অঙ্কুরিত হতে থাকে। অনেকেই বর্ণ, গোত্র ও আত্মপরিচয় গোপন করে বা অস্বীকার করে নতুন ভাবে সমাজে পরিচিত হতে চাইলেন। যেমন মৎস্যজীবী কৈবর্তরা অধিকতর সামাজিক মর্যাদা দাবি করে নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। এই ভাবেই গোপ ও তেলি সমাজও সামাজিক মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনগুলির ফলে বিভিন্ন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের 'জল অচল' মানুষরা (অর্থাৎ যাদের স্পর্শ করা জল বর্ণহিন্দু সমাজে পানের যোগ্য ছিল না) ধীরে ধীরে 'জল চল' সম্প্রদায়ে উন্নীত হতে পেরেছিল। বর্ণ বিভাজন অনুসারে শূদ্র বলতে তাদেরই বোঝানো হত, যারা অন্ত্যজ শ্রেণি (যেমন ব্যাধ, হাজি, ডোম, মুচি, মেথর, চামার, চণ্ডাল প্রভৃতি)। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার অবসানের দাবিতে দীর্ঘদিনের জমে-থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল শূদ্র জাগরণ আন্দোলনে। পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাধ্যমে অন্ত্যজ শ্রেণির সামাজিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সূচনা ঘটল। নমশূদ্র কারা ও এদের উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ মাতা ও শূদ্র পিতার ঔরসজাত সন্তানগণই চিহ্নিত হলেন নমশূদ্র হিসাবে। নমশূদ্রের বসবাস সমগ্র বাংলাদেশে সংখ্যায় বেশি না হলেও পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্ববঙ্গের বরিশাল, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, পদ্মা-মধুমতী নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী নমশূদ্ররা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নমশূদ্র সমাজ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যত সোচ্চার হতে থাকলেন, উচ্চবর্ণের মানুষ হিসাবে যারা সমাজে পরিচিত, তারা নমশূদ্র সমাজের প্রতি তত বেশি দুর্ব্যবহার শুরু করলেন। পূর্ববঙ্গের কায়স্থরা বিদ্বেষপ্রসূত মানসিকতা থেকেই নমশূদ্রদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। কার্যত বাধ্য হয়েই নমশূদ্ররা স্বজাতির সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে সামিল হন। ১৮৭৩ সালে সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে নমশূদ্র সংখ্যাধিক্য ছিল না। নমশূদ্র সমাজ একটি কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য অংশের জনসাধারণকেও তাদের আন্দোলনে সামিল করার চেষ্টা করেন। ১৮৭৩ সালে নমশূদ্র সমাজের ডাকে ফরিদপুর জেলায় সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হলে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

উনিশ শতকে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এই ধরনের ধর্মঘট অভিনব শুধু নয়, বাংলাদেশের ধর্মঘটের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী অধ্যায়। ধর্মঘটের মাধ্যমে নমশূদ্র সমাজের পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়। তাদের প্রধান দাবি ছিল, তারা অন্য কোনও জাতির সেবা করবেন না। দ্বিতীয় দাবি ছিল, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের রান্না করা অন্ন গ্রহণ করবেন না। নমশূদ্রদের মধ্যে অনেকেই জাতিগত বৃত্তি বর্জন করেন। নৌকার মাঝি-মাল্লার জীবিকাও গ্রহণ করেন। ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদ প্রথার শিকড় বহু গভীরে প্রোথিত। শুধু একটি ধর্মঘট করলেই সামাজিক অবিচারের অবসান ঘটে না। সেই কারণেই ওই ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত দাবি পূরণে সফল হয়নি। নমশূদ্র সমাজের জাতিগত ও সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তিও বর্ণহিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু বর্ণব্যবস্থার কারণে গড়ে-ওঠা আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা অবসানের দাবিতে এই ধর্মঘট কার্যত ছিল মানবতাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনের হিসাবনিকাশ জয়-পরাজয়ের নিরিখে হবে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রক্ষণশীল পরিমণ্ডলে শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত মানুষরা স্বজাতির অধিকারবোধে উদ্দীপ্ত ওই আন্দোলন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

সংগঠিত শিল্পে প্রথম ধর্মঘট

১৮৬২ সালের হাওড়া স্টেশন রেল ধর্মঘট বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা যায় তাতে দেখা যায় যে, ভারতের শিল্প-শ্রমিকদের প্রথম ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল নবগঠিত রেলওয়েতে। ১৮৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেলশ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। লক্ষ রাখতে হবে যে, ভারতের প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে এবং বাংলায় রেলপথ স্থাপিত হয় তার পরের বছর ১৮৫৪ সালে। রেলপথ স্থাপনের মাত্র ৭/৮ বছর পরই ভারতের রেল শ্রমিকদের এই ধর্মঘট যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

কলকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বাংলা সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'-এ এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

'সম্প্রতি হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমোটিভ (গাড়ি) ডিপার্টমেণ্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য স্থগিত রহিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন, নচেৎ লোক পাইবেন না।'

এই ধর্মঘটের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, আমেরিকার শিকাগোতে ১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের ঘটনাবলি সংগঠিত হওয়ার ২৪ বছর পূর্বেই ভারতের রেল-শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন। এই তাৎপর্য আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিল্পের দ্রুত প্রসার এবং শিল্প-শ্রমিক গড়ে ওঠা সত্ত্বেও, সেই সময়ে শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ১৮৬২ সালের হাওড়া স্টেশনের রেল-শ্রমিক ধর্মঘটই ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকদের সংগ্রামী ইতিহাসের সূচনা করে। অনগ্রসর দেশের শ্রমিকশ্রেণির এই আন্দোলন অনেক বেশি মর্যাদা দাবি করতে পারে। আন্তর্জাতিক প্রেরণা থেকে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের জন্ম হয়নি। ভারতের শ্রমিক আন্দোলন দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

অ-শিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট এই সময়ে বোম্বাই শহরেও প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮৬৬ সালে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন মাংস বিক্রেতারা ধর্মঘট করে। এই রকম আমেদাবাদেও ইট শিল্পের শ্রমিকদের এবং দর্জিদের ধর্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায়। এই ধর্মঘটগুলি সংগঠিত হয় ১৮৭৩ সালে।

১৮৬২ সালে হাওড়ার রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের পরে আর একটি বৃহৎ শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘটের নজির পাওয়া যাচ্ছে, তা হচ্ছে ১৮৭৭ সালে নাগপুর এমপ্রেস মিলে শ্রমিকদের ধর্মঘট। শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ছিল মজুরি সংক্রান্ত দাবিতে। কিন্তু এই ধর্মঘটের কোনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

১৮৮০ সালের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তারের তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে শ্রমিকদের সংগ্রাম পর্যালোচনা করে ড. আর কে দাস লিখেছেন, '১৮৮২ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের নজির পাওয়া যায়। কিন্তু ছোটখাটো ধরনের ধর্মঘট আরও ঘন ঘন সংগঠিত হত।' বোম্বাইয়ের চিফ ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিজের মি. এন এ মস সাক্ষ্য দেন, 'অনেকগুলো ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। প্রতিটি কারখানায় বছরে অন্তত দু'বার ধর্মঘট হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মঘটই স্বল্পকাল স্থায়ী

ছিল এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকরাই সবক্ষেত্রে হার স্বীকার করেছে। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের জরিমানা দিতে হয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা বকেয়া বেতন হারিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যাওয়ার কারণ সাময়িক, যেমন পূর্বাহ্নে কোনও রকম বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে মজুরি হ্রাস করে দেওয়া...।' বোম্বাই সরকারের আর একজন মুখপাত্র মন্তব্য করেন, ইংল্যাণ্ডে ধর্মঘট ও লকআউট বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু এখানে ঘটেনি। বোম্বাইয়ে যে ধর্মঘটগুলি হয়েছে, সেগুলি কারখানাভিত্তিক ভাবে বা কারখানার কোনও কোনও ডিপার্টমেণ্টে সংগঠিত হয়েছে। এই ধর্মঘটগুলি তিন দিনের বেশি স্থায়ী হয়নি। মজুরি হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টাই এই ধর্মঘটগুলির কারণ বলে জানা যায়।

রয়্যাল কমিশনের কাছে প্রদত্ত এই সাক্ষ্যগুলি থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, এই সময় ধর্মঘট ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়েছে, তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, আধুনিককালের কায়দায় সংগঠিত ধর্মঘট সে যুগে সম্ভব ছিল না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মজুরি হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণ তীব্র করার বিরুদ্ধে শ্রমিকরা অসংগঠিত ভাবে এবং স্বল্পকালের জন্য হলেও রুখে দাঁড়িয়েছে এটাই বাস্তব সত্য। শুধু বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নয়, বাংলার পরিস্থিতিও ছিল অনুরূপ।

বাংলা সরকারের একজন মুখপাত্র তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, 'খুব গুরুত্বপূর্ণ বা সাধারণ দাবিদাওয়াসম্পন্ন কোনও ধর্মঘট বা লকআউট সংগঠিত হয়নি। যখন কোনও ডিপার্টমেণ্টে অন্য ডিপার্টমেণ্টের তুলনায় বেশি মজুরি থাকার দরুন অথবা কোনও মিলে পার্শ্ববর্তী কোনও মিলের তুলনায় বেশি মজুরি থাকার দরুন সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বা মিলের শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তখন সেই ডিপার্টমেণ্ট বা মিলে শ্রমবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এই রকম ভাবে ঘুসুরি কটন মিলে ১৮৮১ সালে এবং ১৮৯০ সালে দু'বার ধর্মঘট হয়েছে। প্রথম ধর্মঘটটি ১০ দিন স্থায়ী ছিল এবং দ্বিতীয়টি চলেছিল তিন দিন পর্যন্ত। ধর্মঘটের কারণ ছিল মজুরি হ্রাস করে দেওয়া, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা মালিকদের শর্ত মেনে নিয়েছিল, যদিও কোম্পানি জানিয়েছে যে, তাদের দুটো ধর্মঘটের ফলে ২০০০ টাকা লোকসান হয়েছে। কোনও শিল্পভিত্তিক সংগঠিত ধর্মঘট বা কোনও একটা মিলের সমস্ত শ্রমিকের সংগঠিত ধর্মঘট কখনও হয়নি।

বাংলাদেশে সরকারি কর্তৃপক্ষ কমিশনের কাছে ধর্মঘটের গুরুত্ব যতই ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, ১৮৮০ সালের পরবর্তী কালে বাংলাদেশে বহু সংখ্যক ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। তখনকার দিনের অবস্থায় শ্রমিকদের এই প্রতিরোধ-সংগ্রাম শ্রমিকদের সহজাত সংগ্রামী মনোভাবেরই দ্যোতক। লক্ষণীয় যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি অনুযায়ী ধর্মঘটগুলির কারণ ছিল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করে দেওয়া। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ মালিক বা ভারতীয় মালিকদের ক্ষেত্রে কোনও পার্থক্য ছিল না। শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের কোনও দেশভেদ বা জাতিভেদ নেই।

দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮০ সালের পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধর্মঘট সংগ্রামের যে তথ্যগুলি পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ধর্মঘটগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায়:

১. ১৮৮২ সালের শেষ দিকের সুরাটের গুলাম বাবা স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলে দু'বার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘট হয় ১৩ ও ১৪ নভেম্বর। দ্বিতীয় ধর্মঘটটি হয় ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর। দুটো ধর্মঘটই ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধের ফলে সংগঠিত হয়।

২. কুর্লা স্বদেশি মিলে ১৮৮৭ সালে একবার ধর্মঘট হয়। ধর্মঘট তিন দিন স্থায়ী হয়। শ্রমিকদের কম মজুরিই ধর্মঘটের কারণ বলে জানা যায়।

৩. বাংলার ঘুসুরি কটন মিলে ১৮৮১ সালে একবার এবং ১৮৯০ সালে আরেক বার ধর্মঘট হয়। প্রথম ধর্মঘটটি দশ দিন এবং পরবর্তী ধর্মঘটটি তিন দিন স্থায়ী হয়। এই সম্পর্কে সরকারি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ওয়ার্ধা হিংগনঘাট মিলের কর্তৃপক্ষের দৈনিক এক হাজার টাকা লোকসান হয়।

ওই মিলে প্রথম ধর্মঘট হয় ১৮৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় ধর্মঘট হয় ১৮৮৭ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল। তৃতীয় ধর্মঘট হয় ১৮৮৮ সালের ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ এবং চতুর্থ ধর্মঘট হয় ১৮৮৯ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর।

৫. কোয়েম্বাটোর স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলে ১৮৯১ সালে ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট ১০ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ৩৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। জানা যায়

যে, কর্তৃপক্ষ একজন শ্রমিককে প্রহার করে এবং তার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট।

৬. মাদ্রাজের সাদার্ন ইণ্ডিয়া স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ জানায় যে, ১৮৮১ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত তাদের মিলে পাঁচবার ধর্মঘট হয় এবং প্রতিটি ধর্মঘটে মিল কর্তৃপক্ষের ২০০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা লোকসান হয়।

৭. কুর্লা স্পিনিং এবং উইভিং মিলের কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ওই মিলে ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে একটি ধর্মঘট হয়েছে।

৮. বোম্বাইয়ের নওরোসজি ওয়াদিয়া অ্যাণ্ড সন্স-এর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ওই মিলে দু'বার ধর্মঘট হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও জানান যে, মজুরি হ্রাসই এই ধর্মঘটের কারণ।

৯. বোম্বাইয়ের হীরামানেক অ্যাণ্ড কোং পরিচালিত ৩টি মিলে ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসে ধর্মঘট হয়। মজুরি হ্রাসের আশঙ্কাতেই এই ধর্মঘট সংগঠিত হয় বলে জানা যায়। ধর্মঘট কয়েকদিন স্থায়ী হওয়ার পর আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কিন্তু অচিরেই এই মিলগুলিতে আবার শ্রমিকদের বৃহত্তর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোভাবকে 'স্ট্রাইক ম্যানিয়া' বলে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

১০. ১৮৯২ থেকে ১৮৯৩ সালে বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজুরি হ্রাসের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চালায় মালিকরা। এর ফলে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন মিলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে এবং পরে এক সঙ্গে একাধিক মিলেও ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট পরিচালিত হয়। এই সময়ে এটাই ছিল শ্রমিকদের বৃহত্তম এবং এই ধর্মঘটগুলিতে ১২০০০ থেকে ১৪,০০০ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে।

১১. সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেদাবাদের শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। আমেদাবাদ মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে পাক্ষিক বেতন দানের নিয়ম প্রচলন করে। শ্রমিকরা এই নতুন নিয়মের বিরুদ্ধেই ধর্মঘট করে। প্রথমে মিলগুলির তাঁতিরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে এবং পরে অন্যান্য শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। ১৮৬৯ সালে আমেদাবাদে প্রথম মিল প্রথম মিল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন দানের নীতি চালু ছিল। এই পুরাতন নীতি পরিবর্তনের

বিরুদ্ধে শ্রমিকরা যে ধর্মঘট করেন আমেদাবাদের প্রেসিডেন্সি ইন্সপেক্টর তাকে আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মঘট বলে অভিহিত করেন। ধর্মঘট ১০ দিন স্থায়ী হওয়ার পর এর অসফল পরিসমাপ্তি ঘটে বলে জানা যায়।

১২. ১৮৯৫ সালে এবং ১৮৯৬ সালে কলকাতার সন্নিকটস্থ বজবজ জুট মিলে দু'বার ওই সময়কার অন্যতম বৃহত্তর ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৯৫ সালের ধর্মঘট ছয় সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং কোম্পানির ৮০,০০০ টাকা ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। ১৮৯৬ সালের ধর্মঘট ৮ দিন যাবৎ স্থায়ী হয়। এ ছাড়াও এই দু'বছরে ওই মিলে আরও কয়েকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

বজবজ জুট মিলের প্রথম ধর্মঘটটি অত্যন্ত ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়, এই ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ধর্মঘট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়:

'মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় বজবজে এক গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে। ইউরোপীয় কর্মচারীরা যে বাংলোতে বাস করে বজবজ জুট মিলের প্রায় ৯ হাজার শ্রমিক সেই বাংলোর নিকট সমবেত হয়। জানা যায় যে, শ্রমিকদের সঙ্গে সর্দারের বিরোধ হয় এবং শ্রমিকরা ঘোষণা করে যে, সর্দারকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা না হলে ধর্মঘট করা হবে। মিল কর্তৃপক্ষ এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শ্রমিকরা দলবদ্ধ হয়ে বাংলোতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে জানালার কাচ ইত্যাদি ভেঙে দেয়। ইউরোপীয় শ্রমিকের উপর গুলিবর্ষণ করে। দু'জন হাঙ্গামাকারী আহত হয় এবং আলিপুর হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হয়। জনতার প্রহারে আহত দু'জন পুলিশ কনস্টেবল এবং মিলের একজন দারোয়ানকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জেলার পুলিশ সুপারকেও তার করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে আসার আগেই জনতা প্রস্থান করে। কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উপরোক্ত কয়েকটি ধর্মঘটের তথ্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, শ্রমিকরা তখনও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত না হওয়া সত্ত্বেও মজুরি হ্রাস ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছিল। বজবজের ধর্মঘট নিঃসন্দেহে সেই যুগের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল।

বজবজ জুটমিলের এই ধর্মঘট এবং অন্যান্য জুটমিলের শ্রমিকদের

সংগ্রামের কিছু তথ্য পাওয়া যায় ১৮৫৯—৯৬ সালের বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে। ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন বাংলার এই মিলগুলির শ্রমিকদের প্রতি ইউরোপীয় মালিকদের আচরণ, শ্রমিকদের সংগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে রিপোর্টের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল:

চব্বিশ পরগনা জেলায় শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে কতকগুলি হাঙ্গামা হয়েছিল। প্রথম হাঙ্গামা ঘটে এপ্রিলের প্রথম দিকে টিটাগড় জুটমিলে। বকরঈদ উৎসবের সময় কিছু মুসলমান কাজে অনুপস্থিত ছিল এবং তাদের মজুরি না দেওয়ার পরিণামেই এই ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শনমূলক বিক্ষোভ সংগঠিত করে। এবং যখন পুলিশ দলের নেতাদের গ্রেফতার করতে আসে, তখন হাঙ্গামা বাধে এবং পুলিশের সঙ্গেও উগ্র ব্যবহার করা হয়। তিনজন লোককে গ্রেফতার করে সাজা দেওয়া হয়। অনুরূপ অসুবিধাজনক ঘটনা ঘটে কামারহাটি মিলে মহরমের সময়। কিন্তু ছুটি প্রদান করে ওই সমস্যার সমাধান করা হয়। এই হাঙ্গামাগুলির প্রতিকূল দিকটা ছিল এই যে, ইউরোপীয় কর্মচারীরা আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল। টিটাগড়ের ঘটনায় গুলি চালানো হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোনও গুরুতর ঘটনা ঘটেনি। কামারহাটি মিলের ঘটনার সময় ইউরোপীয় কর্মচারীরা স্বেচ্ছাবাহিনীর অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছিল সম্ভাব্য হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য। কাঁকিনাড়া মিলে আরেকটি ঘটনা ঘটে। ওই মিলে ম্যানেজার স্পিনার্সদের মজুরি সাড়ে তিন টাকা থেকে সোয়া তিন টাকায় নামিয়ে দেয়। নদীর অপর পারে এবং শ্যামনগরে নতুন মিল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্পিনার্সরা বর্ধিত মজুরি দাবি করে। ম্যানেজার দলের নেতাদের আটক করার চেষ্টা করে। এর ফলে কিছুটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়, কিন্তু কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে না। পুলিশ দলের নেতাদের গ্রেফতার করে এবং শান্তি রক্ষার জন্য এদের আটক রাখা হয়। জানা যায় যে, সব সময়ে এক সপ্তাহের বেতন হাতে রাখার পদ্ধতি এই হাঙ্গামার অন্যতম কারণ। এতে সন্দেহ নেই যে, শ্রমিকরা এর ফলে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, কারণ এই পদ্ধতির দরুন এক সপ্তাহের মজুরি উৎসর্গ না করে শ্রমিকদের পক্ষে মিল ছেড়ে অন্য ভাল চাকরিতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কমিশনার ম্যানেজারদের কাছে এই দিকটা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়নি। জুলাই মাসে গার্ডেনরিচে একটি চটকলে স্পিনার্সরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেন।

কিছু দাবি-দাওয়া মিটিয়ে ধর্মঘট এড়ানো হয়।

এই প্রসঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজে সমসময়ে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ব্যাপকতা দেখা যেতে পারে।

১৮৯৭ সালে বোম্বাইতে শ্রমিকরা ব্যাপক হারে ধর্মঘটে অবতীর্ণ হন। ওই সময় বোম্বাই শহরে বুবনিক প্লেগের মারাত্মক প্রাদুর্ভাবের দরুন শহরের মানুষরা গ্রামের দিকে ছুটেছিল। শ্রমিকদেরও একটা বিরাট অংশ কারখানা ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেয়। ফলে শহরে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। সেই সময় মালিকরা মাসিক বেতন দানের পরিবর্তে দৈনিক মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ শুরু করে। প্লেগ মহামারি দূরীভূত হলে পর যখন শ্রমিকরা আবার শহরে ফিরে আসে এবং চাকুরির সন্ধান করে, তখন মালিকরা দৈনিক মুজরি বন্ধ করে পুরনো মাসিক বেতনের প্রথা চালু করে। তখন শ্রমিকরা মাসিক বেতনের প্রতিবাদে এবং দৈনিক মজুরির দাবিতে ধর্মঘট করেন। প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায়, ওই ধর্মঘট সফল হয়নি। মালিকেরা শ্রমিকদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, শ্রমিকদের কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে এবং তাদের মজুরিও কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। মালিকরা এটাও সিদ্ধান্ত করে যে, তারা শ্রমিকদের একটা বিকল্প তালিকা প্রস্তুত করে রাখবে এবং কর্মরত শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের কাজে লাগানো হবে।

মাদ্রাজে বিন্নি অ্যাণ্ড কোং-এর কর্তৃপক্ষ জানান, 'আমারা অনেকগুলো ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। প্রায়ই ধর্মঘট হচ্ছে। কারখানার আকার এবং প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত লোকসান হচ্ছে। মাদ্রাজের হায়ডে অ্যাণ্ড কোং-এর কর্তৃপক্ষের সাক্ষ্য অনুযায়ী, 'প্রায়ই বিরোধ ঘটেছে, তবে এই বিরোধগুলিকে ধর্মঘটের মতো উচ্চপর্যায়ের বলা যায় না।' নাগপুর এমপ্রেস মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেন, 'জরিমানা আরোপ করা এবং মজুরি হ্রাসের জন্য উত্তর ডিভিসনে প্রায়ই একদিন বা দু'দিনের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি শ্রমবিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে।'

আরও শোনা যায় যে, জিআইপি রেলওয়ে সিগনালিং স্টাফরা ১৮৯৯ সালে ধর্মঘট করেন। টেলিগ্রাফি জানা স্টেশন মাস্টার ও সহকারী স্টেশন মাস্টাররাও এই ধর্মঘটে যোগ দেন। দাবি ছিল কাজের ঘণ্টার পরিবর্তন, বেতন বৃদ্ধি, ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য বিলোপ।

ধর্মঘট শুরু হলে কর্তৃপক্ষ বরখাস্তের হুমকি দেয় এবং আরও বিভিন্ন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে। ২৭ দিন ধর্মঘট চলার পর কর্মচারীরা কাজে ফিরে আসেন।

১৮৬২ সালে হাওড়া স্টেশনে রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট থেকে আরম্ভ করে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ভারতের শ্রমিকশ্রেণি তার এই শৈশবেই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হলেও প্রতিটি শিল্পকেন্দ্রেই প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। স্পষ্টতই সমসাময়িককালের প্রধানতম দু'টি সমস্যা— অত্যধিক কাজের সময় এবং অত্যন্ত নিম্ন মজুরির বিরুদ্ধেই এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছিল। সংগ্রামগুলি কোথাও সফল হয়েছে, কোথাও হয়েছে আংশিক সফল। আবার কোথাও সংগ্রামগুলি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এই সমস্যাগুলির চরিত্র ছিল পুরোপুরি অর্থনৈতিক। কিন্তু সংগ্রামগুলির চরিত্র ও ধরন থেকে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে, পুঁজিবাদী শোষণ ভারতের শ্রমিকশ্রেণি তার শৈশবেও মেনে নেয়নি এবং সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হলেও শ্রমিকশ্রেণি তার শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক

১৯০৫ সালের ২৪ মার্চ নারকেলডাঙ্গা সুরথ জুটমিলের শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট শুরু করল।

রেল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং পাশাপাশি কাজের প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধির ফলে ১৯০৭ সালে রেল শ্রমিকরা তীব্রতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হল। ১৯০৫—০৮ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণজাগরণে রেল শ্রমিকদের অবদান ছিল অসামান্য।

কর্তৃপক্ষের নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে বৃহৎ বৃহৎ রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১ মে বোম্বাইয়ের রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ৩০০০ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু দাবিদাওয়া আদায় হওয়ার পরই এই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৯০৭ সালে বৃহত্তম ধর্মঘটগুলি সংগঠিত করেন পূর্ব ভারতের রেল শ্রমিকরা। ১৮ নভেম্বর গার্ড এবং ইঞ্জিন ড্রাইভাররা ধর্মঘট শুরু করেন। এই ধর্মঘটী কর্মচারীরা অধিকাংশই ইংরেজ অথবা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন।

ধর্মঘটীদের মধ্যে ভারতীয়রা ছিলেন সংখ্যাল্প। ধর্মঘটীদের দাবিদাওয়াও ছিল অর্থনৈতিক। কিন্তু এই ধর্মঘট দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণের কাছে শ্রমিকশ্রেণির দৃঢ়তা এবং তার পরিচালিত গণসংগ্রামের শক্তি আদর্শ হিসেবে কাজ করেছিল।

আসানসোল স্টেশনে এই ধর্মঘট শুরু হয়ে এলাহাবাদ ও টুণ্ডলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়ে। শ্রমিকরা মোট ৪৩ দফা দাবিতে এই ধর্মঘট করেন। চাকুরির শর্তাবলির উন্নতিবিধান, প্রচলিত সময়ভিত্তিক মজুরিদানের প্রথার বিরুদ্ধে দূরত্বভিত্তিক মজুরি-প্রথা প্রচলন, জরিমানা ও অন্যান্য আর্থিক শাস্তির মাধ্যমে বেতন কেটে নেওয়ার স্বৈরাচারী পদ্ধতির পরিবর্তন ও অন্যান্য দাবি ছিল এই দাবিসনদের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মঘট এত সফল হয়েছিল যে, কলকাতায় কোনও ট্রেন আসেনি, কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের একটি ট্রেন এই লাইনে চালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ২০০ রেলশ্রমিক রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে সরকারের ওই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। হাওড়া স্টেশনের শ্রমিকরা সভা করে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া এবং হাওড়া স্টেশন থেকে কোনও ট্রেন যেতে না দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ফলে মালগাড়ির প্রায় ৩০০ ওয়াগন স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল এবং শত শত যাত্রীও স্টেশনে আটকে পড়ল। হাওড়া-কালকা লাইনে কোনও গাড়ি চলাচল করল না। এই অচলাবস্থার পরিস্থিতিতে কলকাতার কারখানাগুলিতে কয়লার অভাব ঘটল এবং কলকাতা বন্দরেও জাহাজগুলি আটক হয়ে রইল। কারণ রেল চলাচল না হওয়াতে জাহাজগুলি ভর্তি করা বা খালাস করা গেল না। ২৪ নভেম্বরের মধ্যে ১০০০ খালি ওয়াগন এবং ৪০০ মালভর্তি ওয়াগন আটক হয়ে রইল। ধর্মঘট বর্ধমান, আসানসোল, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, টুণ্ডলা, কানপুর, আম্বালা ইত্যাদি বিভিন্ন স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ে রেল চলাচল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিল।

কর্তৃপক্ষ তখন দমননীতির আশ্রয় নিলেন। স্টেশনগুলিতে সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ আমদানি করা হল। হাওড়া স্টেশনকে সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু পরিণাম হল বিপরীত। ধর্মঘট বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতেও বিস্তারলাভ করল। ঘটনার এই গতিতে সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ী মহল আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। ২৪ নভেম্বর খড়গপুরে রেলওয়ে গার্ডরা ধর্মঘট

করলেন। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের ইঞ্জিন ড্রাইভার দিয়ে পার্শ্ববর্তী লাইনে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু এতে ড্রাইভারদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। কিন্তু এই রেলওয়েতে ধর্মঘট ২৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়নি, কারণ কর্তৃপক্ষ একটা শান্তি কমিটি স্থাপন করে ধর্মঘটীদের দাবিদাওয়া মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়, মজুরি কাটা বন্ধ, জরিমানা সীমাবদ্ধ, নতুন ইনসিওরেন্স ফাণ্ড রুল চালু করা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

এই ধর্মঘট মিটতে না মিটতেই আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে এবং অসম বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘটের নিশ্চিত আশঙ্কা সৃষ্টি হল।

২৪ নভেম্বর বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স কর্তৃপক্ষের কাছে এক বিশেষ বার্তা প্রেরণ করে অনুরোধ করল যে, রেলশ্রমিকদের বিরোধগুলির মীমাংসার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের প্রচলিত প্রথামত যেন একটা সালিশি বোর্ড গঠন করা হয়। পরদিনই সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ২৮ নভেম্বর, ১৯০৭ রেলশ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে 'সালিশি বোর্ডের' নিকট দাবিদাওয়া পেশ করতে রাজি হলেন। কানপুরের রেলওয়ে শ্রমিকরা একই শর্তে কাজে ফিরে এলেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়েতে এই ব্যাপক ধর্মঘট ১৮ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর ১৯০৭, এই দশদিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল এবং এই ধর্মঘটের ফলে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়নের (১৯২৭—১৯৪৫) বিস্তার
ধর্মঘট ও বিরোধ

১৯২৬ সালে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট পাশ হবার পরে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মোট রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন, সদস্য সংখ্যা এবং শ্রমবিরোধের তুলনামূলক চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ:

ইউনিয়ন সদস্য— শ্রমবিরোধের সংখ্যা

বৎসর	রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন	সদস্য	শ্রমবিরোধ
১৯২৭-২৮	২৯	১,০০,৬১৯	১২৯
১৯২৮-২৯	৭৫	১,৮১,০৭৭	২০৩
১৯২৯-৩০	১০৪	২,৪২,৩৫৫	১৪১
১৯৩০-৩১	১১৯	২,১৯,১১৫	১৪৮
১৯৩১-৩২	১৩১	২,৩৫,৬৯৩	১৬৬
১৯৩২-৩৩	১৭০	২,৩৭,৩৬৯	১১৮
১৯৩৩-৩৪	১৯১	২,০৮,০৭১	১৪৬

উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯২৯ সালে এআইটিইউসি-র বিভাজনের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাটার টান ছিল লক্ষণীয়। ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩০-৩১ সাল এই এক বছরে রেজিস্টার্ড ট্রেড

ইউনিয়নের সংখ্যা ১০৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৯ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ২,৪২,৩৫৫ থেকে হয়ে যায় ২,১৯,১১৫। বাংলাদেশেই রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা সব থেকে বেশি বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ সালে রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন ছিল ১৮টি, ১৯৩১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৪টি। ১৯৩১-৩২ সালে সারা ভারতে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৩১টি, সদস্য সংখ্যা ছিল ২,৩৫,৬৯৩। এই বছর মাদ্রাজে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের ১৭টি থেকে বেড়ে হয় ২৩টি। ১৯৩২-৩৩ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩২টি ইউনিয়ন থেকে ৪৪টি। ১৯৩৩-৩৪ সালে সারা ভারতে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১৯১টি, কিন্তু সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২,০৮,০৭১। লক্ষণীয়, ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কমলেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শ্রমবিরোধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯২৭ সালের প্রারম্ভ থেকে দেশব্যাপী যে শ্রমিক ধর্মঘট ও সংগ্রাম শুরু হল এবং ১৯২৮-২৯ সালে যা চূড়ান্ত আকার ধারণ করল, তার তীব্রতা ও বিস্তৃতির সঙ্গে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির অতীত সংগ্রামগুলির কোনও তুলনা হয় না। ১৯২৭ সালে প্রদেশভিত্তিক ধর্মঘটের পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলায় ৩৪টি ধর্মঘট হয়েছিল। এই ধর্মঘটে যুক্ত হয়েছিলেন ৬৬, ৬৭৪ জন শ্রমিক। ১৯২৮-২৯ সালে ধর্মঘটগুলি এত তীব্র আকার ধারণ করে এবং একমাত্র ১৯২৮ সালে ভারতে মোট ৩ কোটি ১৫ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। বাংলায় ৬০টি ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯২৭ সালে বাংলার খড়্গপুরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের শ্রমিকদের পর পর দু'বার ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য। ১৯২৮ সালের ২৮ মার্চ ১০,০০০ শ্রমিক ফেয়ারলি প্লেসে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সদর দফতরে এজেন্টের নিকট মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। (সূত্র: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, সুকোমল সেন, পৃ. ২২২)

১৯২৯ সালে এআইটিইউসি-তে প্রথম ভাঙনের সময় একমাত্র জিআইপি রেলওয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ব্যতীত অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রেলওয়ে ইউনিয়নগুলি-সহ সিমেনস

ইউনিয়নও এআইটিইউসি ছেড়ে চলে যায়। তা ছাড়া, ডাক বিভাগের কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি এবং আমেদাবাদের মজুর মহাজন কোনও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী এআইটিইউসি-র বাইরেই ছিল। কিন্তু ধর্মঘটের তীব্রতা শ্লথ হয়নি।

চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট

১৯২৯ সালে চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের অনেক আগে থেকেই বাংলার চটকল সমূহের শ্রমিক-কর্মচারীগণ লাগাতার আন্দোলন ও ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। দেওয়ান চমনলাল 'দি স্টোরি অব লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল ইন ইণ্ডিয়া (ভল্যুম ১, পৃ. ৩৯)' গ্রন্থে এই ধর্মঘটগুলির তালিকা দিয়েছেন:

বৎসর	ধর্মঘটের সংখ্যা	ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকের সংখ্যা	নষ্ট হওয়া শ্রম দিবস
১৯২১	৩৯	১,৮৬,৪৭৯	৭,০৬,২২৯
১৯২২	৪০	১,৭৩,৯৫৭	১০,৭৯,৬২৭
১৯২৩	২৯	৯০,৬৬৪	৬,৪৪,৮০৪
১৯২৪	১৮	৬৯,৪৮৮	৩,৪৬,৭৫০
১৯২৫	১৪	৪৪,৯৪০	২,৪২,৯০৬
১৯২৬	২৯	৩৮,০৪২	৭,৯৪,৩৮৪
১৯২৭	৯	৩৪,৯০০	২,১৮,০০০
১৯২৮	১৮	৫৬,৫২৪	১৫,০৮,৭০৮
১৯২৯ সালের জুন পর্যন্ত	৫	১৮,২৮৫	১,০৬,৭৮৫
	২০১	৭,১৩,২৭৯	৫৬,৪৮,১৯৯

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চটকল শ্রমিকদের যে সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল, সেটাই সংঘঠিত প্রথম সাধারণ ধর্মঘট। গণবাণী পত্রিকা ১৯২৮ সালের ২৬ জুলাই লিখেছিল 'ইউরোপীয় মালিকরা চটকল শ্রমিকদের উপর যে নির্যাতন চালাত তার খতিয়ান তৈরি করলে অতীতে ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারও ম্লান হয়ে যাবে।'

১৯২৯ সালের চটকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘটের কারণ ছিল শ্রমিকদের কাজের সময় সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি করে ৬৪ ঘণ্টা করা। ইণ্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করে ১৯২৯ সালের ১ জুলাই থেকে কাজের সময় বৃদ্ধি হবে। তার প্রতিবাদেই শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য হয়। ৬ জুলাই থেকে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। দেওয়ান চমনলালের বিবরণ অনুযায়ী ৫ অগস্টের মধ্যে এই ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটের রূপ ধারণ করে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ধর্মঘট সংঘঠিত হয়েছিল। দৃঢ়তার সঙ্গে এই ধর্মঘট চলতে থাকায় মীমাংসায় অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। মালিকপক্ষ ৬৪ ঘণ্টার কাজের নোটিশ প্রত্যাহার করে পুনরায় ৫৪ ঘণ্টার কাজ চালু করে। ইউনিয়ন গঠনে মালিকপক্ষ বাধা দেবে না এটাও অন্যতম শর্ত থাকে।

বাংলার চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বোম্বাই, নাগপুর এবং অন্যান্য প্রভিন্সে বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি অত্যন্ত লড়াকু মনোভাব ও ত্যাগস্বীকারের মধ্য দিয়ে সংঘঠিত হলেও ১৯৩০ সালে এআইটিইউসি-র ভাঙনের ফলে নেতৃত্বের অনৈক্য নিচুতলায় ফাটল সৃষ্টি করেছিল। ফলে পুঁজিপতিশ্রেণির প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত এই ধর্মঘটগুলি প্রত্যাশা অনুসারে সফলতা লাভ করতে পারেনি, কিন্তু আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, পরবর্তী কালে ঐক্য ও সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

ধর্মঘটের ব্যাপকতা

তিরিশের দশকের মধ্য ভাগ থেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিস্তারলাভ করে। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত প্রভিন্সেই ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে বাংলা প্রভিন্সে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন

ও সদস্য সংখ্যায় অন্যান্য প্রভিন্সের থেকে তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৩-৩৪ থেকে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বাংলায় ৪২৭টি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি হয়। এই সময়ে বোম্বাইতে ২৬০টি ও মাদ্রাজে ১৯৯টি ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি হয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্যের আকাল হওয়ার ফলে দেশব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাপনের মান ক্রমাগত নীচে নেমে যায়। এই সময় ১৯৩৯—৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা, ঢাকা, কানপুর, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, জামসেদপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, নাগপুর, মাদ্রাজ, অসমের ডিগবয়-সহ ভারতের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণি ধর্মঘটের পথে নেমে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালের ২ অক্টোবর বোম্বাইয়ের ৯০,০০০ শ্রমিক যুদ্ধবিরোধী ধমর্ঘটে নেমে পড়ে। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণিই প্রথম যুদ্ধবিরোধী ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়। এই সময়ে ১৯৩৯ সালে বাংলার পাশেই অসমের ডিগবয়ে অসম অয়েল কোম্পানির শ্রমিকদের ৮ মাস ব্যাপী ধর্মঘটও উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকশ্রেণি আর্থ-সামাজিক ভাবেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি পেল, শিল্পে দুর্ঘটনা বেড়ে গেল।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল নদিয়া জেলার কুষ্টিয়ায় অবস্থিত মোহিনী মিলের মালিকপক্ষ উৎপাদন বন্ধ করে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদে চার বছরে চারবার ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে বাংলার লক্ষ্মীনারায়ণ টেক্সটাইলস মিল, ঢাকেশ্বরী কটন ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা মালিকপক্ষের শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদে ধর্মঘটে শামিল হতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে পুনরায় এই মিলগুলিতে ধর্মঘট হয়। মালিকপক্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে ও গুলি চালিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৪৬ সালের ২৫ মার্চ এই লড়াইয়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যান চারজন মজুর। শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রামের এই শহিদরা হলেন সুধীর উকিল, প্রাণগোপাল চক্রবর্তী, পবিত্র দে ও বলরাম গোপ। প্রথম দু'জন লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের মজুর, শেষের দু'জন চিত্তরঞ্জন মিলের মজুর।

১৯৩৮ সালের বাঙলার রানিগঞ্জ পেপার মিলের মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করলে ১৫০০ শ্রমিক ধর্মঘটে শামিল হয়। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে শ্রমিকপক্ষ কারখানার গেটে অবস্থান করেছিলেন। তখন মালিকপক্ষের নির্দেশে একটি ট্রাক অবস্থানরত শ্রমিকদের নেতা সুকুমার ব্যানার্জিকে চাপা

দিয়ে হত্যা করে। ১৯৩৯ সালে বাটা জুতো কোম্পানির ৪০০০ শ্রমিক তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৭ সালে আসানসোল ও রানিগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনির ১১০০ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। ১৯৩৭ সালে টিটাগড় অঞ্চলের ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবির সমর্থনে ১৫ দিন লাগাতার ধর্মঘট। ১৯৩৪ ও ১৯৩৯ সালে ট্রাম কোম্পানির শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং অন্যান্য দাবি আদায়ে ধর্মঘট সংঘঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ট্রাম কোম্পানির শ্রমিকরা ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগাতার ৯ দিন ধর্মঘটে শামিল হয়।

১৯৪৬ সালের দিনগুলিতে ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। কলকাতা ও শহরতলির কারখানাগুলিতেই প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রাক-স্বাধীনতা পর্ব

সংগ্রাম ১৯৩৯—১৯৪৫

রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল ১৯৩৯ সলের ৩ সেপ্টেম্বর। ইউরোপ যুদ্ধ বাধার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের ভাইসরয় ভারতের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও পরামর্শের পরোয়া না করেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন। ভারতের জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না রেখেই ভারতকে এই বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হল।

ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত এবং একমাত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সময়টা ছিল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

যুদ্ধের এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতার একটা ভিত্তি খোঁজার চেষ্টা করল। শর্ত ছিল ভারতের একটি অস্থায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্ট স্থাপন করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ওয়ার কেবেনিটের একজন সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করে একটা খসড়া ঘোষণাপত্র দিয়ে। কিন্তু ক্রিপস মিশন

যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার-সহ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রদানের সুপারিশ, মুসলিম লিগ ও রাজন্যবর্গকে প্রকারান্তরে ভেঙে ক্ষমতার অধিকারী করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের দাবি নাকচ করেছিল।

ক্রিপস মিশনের এই ব্যর্থতায় ভারতের জনগণের মধ্যে যেমন রোষের সৃষ্টি হল, তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হল একটা হতাশার ভাব। এক দিকে এই হতাশগ্রস্ত ও অপর দিকে মরিয়া অবস্থায় গান্ধীর নেতৃত্বে ৮ অগস্ট, ১৯৪২ এআইসিসি'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হল বোম্বাই শহরে এবং ওই সভায় 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হল।

এই প্রস্তাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার দমনপীড়নের আশ্রয় নিল এবং নেতৃবৃন্দকে ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা হল। ৯ অগস্ট সকালে সারা ভারতে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব ও নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। বিভিন্ন শহরে হরতাল, ধর্মঘট পালিত হল। জনতার সমেগ পুলিশ মিলিটারির সংঘর্ষে, সশস্ত্র বাহিনীর রক্তাক্ত আক্রমণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেললাইন, পোস্ট অফিস ইত্যাদির উপর জনতার আক্রমণ সব মিলিয়ে দেশে একটা উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বহু স্থানে কৃষকরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। কিন্তু জনতা ছিল নেতৃত্বহীন। অবশেষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জনতার এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে প্রতিহত করতে সমর্থ হল। তবে ১০ সহস্রেরও উর্ধ্বে প্রাণের বিনিময়ে এবং পুলিশ মিলিটারির উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে।

দেশের ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সর্বস্তরের মানুষই এই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সংগ্রাম দমনে দেশব্যাপী যে নির্মম দমনপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ১৮৫৭ সালের পর এত ব্যাপক দমনপীড়ন দেখা যায়নি।

ভারতীয় জনগণের এই অর্থনৈতিক জীবনের উপর যুদ্ধের প্রভাব ছিল মারাত্মক। এই অসহনীয় বোঝা শ্রমিকশ্রেণির ঘাড়ে চেপে বসল। যুদ্ধের সময় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তার লক্ষ ছিল যুদ্ধ-প্রচেষ্টা। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দুই শিফট কাজ চালিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করল। শহরগুলিতে

চাকুরিপ্রার্থী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। ঘিঞ্জি, নোংরা, শিল্পাঞ্চলগুলি আরও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল। শ্রমিকশ্রেণির জীবনধারণের মান উন্নত হল না।

কারখানাগুলিতে নৈশ কাজ প্রায় সর্বজনীন রূপ ধারণ করল। বহুক্ষেত্রে কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি হল, ছুটি কেটে নেওয়া হল এবং ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে অনেক বিধান থেকে মালিকদের রেহাই দেওয়া হল। আইনের বিধান থেকে রেহাই নিয়ে চটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি করে দৈনিক ১০ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা করা হল এবং অনিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলিতে সপ্তাহে ৫৬ থেকে ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হত। চটকলগুলিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুনরায় শিশুশ্রমিক নিয়োগও শুরু হয়েছিল। এমনকী খনিতে ও ভূগর্ভের কাজে নারীশ্রমিক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধ পূর্বকাল পর্যন্ত আর্থিক দিক দিয়ে ভারতীয় শ্রমিকরা অতি ভয়াবহ অবস্থাতেই ছিল এবং যুদ্ধ এই অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে। এই সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে কয়লাখনি শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিকদের অবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ। ভারতের ৩,০০,০০০ কয়লাখনি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে সরকারি রিপোর্টেই বলা হয়েছে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত খনি শ্রমিকদের দৈনিক আয় সাধারণ ভাবে হ্রাস পেয়ে এসেছে। ১৯৩৬ সাল থেকে আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও ১৯৪২ সালেও গড় মজুরি ১৯২৯ সালেরও নীচে ছিল।

খনি শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল ৮ থেকে ১২ আনা। এমনকী ১৯২৯ সালের যে মজুরির হারের কথা বলা হচ্ছে মজুরির সেই হারও ছিল পৃথিবীর খনি-শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম হার।

অনুরূপ ভাবে ভারতের বাগিচাসমূহের ১০.৫ লক্ষ শ্রমিকের চাকরিগত অবস্থাও ছিল ভূমিদাসদের ন্যায়। এই শ্রমিকদের মজুরির হারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৫-৪৬ সালেও এদের মজুরি ১৯২৯-৩০ সালের তুলনায় কম ছিল। ১৯২৯-৩০ সালেই এদের মজুরি ছিল মাসিক ৩ থেকে ৮ টাকা এবং এই মজুরি শ্রমিকদের অনশনের মধ্যেই থাকতে বাধ্য করত অথচ যুদ্ধের সময় এই মজুরির হারেও অবনতি ঘটেছিল।

বাংলার বস্ত্রকল ও চটকল শ্রমিকদের বার্ষিক গড় আয় ১৯৩৯ সালে

ছিল ২৩০ টাকা এবং ১৯৪৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৩৮ টাকা অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৮৮ ভাগ বৃদ্ধি। বাংলায় এত কম হারে বৃদ্ধি, কারণ চটকল শ্রমিকদের বেতন এমনিতেই নিম্নস্তরে ছিল যুদ্ধকালীন সময়ে বৃদ্ধিও অপেক্ষাকৃত কম ছিল। ওই সময় বাংলার খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি খুচরে মূল্যের মোটামুটি হিসেব বলা যায় যে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৬ সালে দ্রব্যমূল্য অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিল্প শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরির এই হ্রাসপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ৭ কোটি ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থাও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এদের মজুরির হার যুদ্ধকালীন সময়ে ছিল অবিশ্বাস্য ও মারাত্মক ভাবে নিম্নস্তরের। যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে এই মজুরি দৈনিক দেড় আনা।

মূল্যবৃদ্ধি খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারি, কালোবাজারি ও দুষ্প্রাপ্যতা কীরূপ স্তরে পৌঁছেছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতের জনজীবনকে কতখানি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত তার প্রমাণ পাওয়া যায় যুদ্ধের সময়ে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বিশ লক্ষ মানুষের অনাহারে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের জীবনধারণের মানকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত হতে হয়। বোম্বাই, কানপুর, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, জামশেদপুর, ধানবাদ, ঝরিয়া, নাগপুর, মাদ্রাজ, অসমের ডিগবয়— এক কথায় ভারতের সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণি ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয়।

১৯৪০ সালে বাংলার বিভিন্ন চটকলে ধর্মঘট হয় এবং শ্রমিকদের শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি হয়। এর পূর্ববর্তী বৎসর বাংলায় বাটার শ্রমিকদের ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৯৪০ সালের মে মাসে মহার্ঘভাতার দাবিতে কলকাতা কর্পোরেশনে ২০ হাজার মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক ধর্মঘট করেন এবং শ্রমিকদের দাবি পূরণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার আশ্বাস পাওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। শ্রমিকদের একটি এনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করে এমনকী ৬ জন শ্রমিককে বরখাস্ত এবং ৭৬ জন শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলায় হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, ২৪ পরগনা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলি মহার্ঘভাতা, যুদ্ধভাতা ইত্যাদি দাবিতেই হয়।

যুদ্ধের জন্য শ্রমিকদের বেতন থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে চাঁদা কেটে নেওয়ার বিরুদ্ধেও লড়াই করেন। চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪১ সালের মে মাসে বরানগর জুট মিলের ৯০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট, ওই বছর জুলাই মাসে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুট মিলে ১২ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট, ১৯৪২ সালে হেস্টিংস জুট মিলে ৪,৫০০ শ্রমিকের ধর্মঘট, ওই সময় এনড্রুইল মিলের ১৫ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট, লরেন্স জুট মিল, হুকুমচাঁদ জুট মিল এবং আরও দু'টি জুট মিলের ২০ হাজার ৫০০ শ্রমিকের ধর্মঘট। ওয়ার অ্যালাউন্স হিসেবে শতকরা ২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধি ওই ধর্মঘটগুলির মূল স্লোগান ছিল।

১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের মিলে ধর্মঘট ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তা ছাড়া, ১৯৪১ সালে ২০০০ জুতো প্রস্তুতকারক শ্রমিকের ধর্মঘট, ওই বছর ভারতীয় ইলেকট্রিক স্টিল ওয়ার্কসে ১,৬৫০ শ্রমিকের বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট, ১৯৪২ সালে কলকাতায় ২০০০ ট্রাম শ্রমিকের শতকরা ২৫ ভাগ মহার্ঘভাতা ও বরখাস্ত শ্রমিকের পুনর্বহালের দাবিতে ধর্মঘট, একই বছরে পোর্ট কমিশনার্সের ২৫০০ শ্রমিকের মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘট এবং কলকাতা কর্পোরেশনের ৮০০০ শ্রমিকের মহার্ঘভাতা ও ন্যায্য দরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দাবিতে ধর্মঘট বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাক ও তার ধর্মঘট
২৯ জুলাই ১৯৪৫

ঐতিহাসিক ডাক ও তার ধর্মঘটের মাধ্যমে ভারতের শ্রমিক-কর্মচারী অন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছিল।

১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ১৬ দিনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বুঝে নিয়েছিল বন্দরের কাল শেষ। ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের দিন সমাগত, আর নয়। বিদ্রোহ আজ চারদিকে। ২৯ জুলাই ব্রিটিশ সরকার বুঝে নিল সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তার হাতের বাইরে চলে গেছে। এক দিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতবর্ষে পদার্পণ সুভাষচন্দ্র বসুর অলৌকিক বীরগাঁথা জনজীবনকে যে ভাবে ব্রিটিশবিরোধী করে তুলেছে, সেখানে ২৯ জুলাইয়ের সার্বিক আন্দোলন ও ধর্মঘট এডফিল্ড টোটার কাজ করল।

ডাক-তার ধর্মঘটের সূচনা হয়েছিল সর্বভারতীয় ভাবে। ভারত সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হল ডাক-তার কর্মচারীরা। অল ইণ্ডিয়া পোস্টম্যান লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়ন ২৭ জুন ভারত সরকারকে নোটিশ দিয়ে বলল ১৪ দিনের মধ্যে তাদের দাবিগুলি পূর্ণ না হলে ১১ জুলাই থেকে তারা ধর্মঘটের পথে নামবেন। ভারত সরকার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করল। ডাক-তার কর্মচারীদের দাবি মেটাতে অতিরিক্ত ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ

টাকা প্রয়োজন হবে। এই টাকা যদি ডাক-তার কর্মচারীদের দেওয়া হয়, তা হলে পোস্টকার্ডের দাম দু-পয়সা থেকে ৪ পয়সা করতে হবে।

অগত্যা ১১ জুলাই ধর্মঘট শুরু হল, সারা ভারতের বড় বড় শহরে লক্ষাধিক কর্মচারী লিপ্ত হল ধর্মঘটে। অনেককে গ্রেফতার করা হল, পুলিশি জুলুম হল কোথাও কোথাও। অনেক টাকা কবুল করে দালালদের দ্বারা আংশিক কাজও চালু রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের চেষ্টা সর্বত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। যারা এই ধর্মঘট ডেকেছিলেন, তারা প্রধানত পিয়ন, প্যাকার। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন বাইরের ভাড়াটে লোকদের দিয়ে কাজ চালু রাখতে। সামরিক বাহিনীর লোকদের দিয়েও কাজ চালু রাখবার চেষ্টা করা হল। পণ্ডিত নেহরু এমনকী মহাত্মা গান্ধীও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালেন। ধর্মঘটের চতুর্থ দিনে ডাক-তার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল নোটিশ দিয়ে বললেন, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে কর্মচারীরা কাজে ফিরে না এলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এতে ফল বিপরীত হল। অল ইণ্ডিয়া পোস্টাল অ্যাণ্ড আরএমএস ইউনিয়ন, অল ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন, এরা একে একে ধর্মঘটের নোটিশ দিল। এই আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মৃণালকান্তি বসু। কারণ উনি এক দিকে যেমন ডাক-তার ইউনিয়নের নানা শাখার সভাপতি, তেমনই এআইটিইউসি-র সভাপতি। ধর্মঘট ৪ দিন চলার পর বাংলা, অসম প্রভৃতি রাজ্যের ডাক-তার কর্মচারী আন্দোলনের নেতাদের এক সম্মেলন হল এবং সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। মৃণালকান্তি বসু এই যুক্ত কমিটিরও সভাপতি হলেন। পঞ্চম দিনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভা হল, যেখানে ডাক-তার কর্মচারীদের সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক, ভূতপূর্ব মেয়র দেবেন্দ্র মুখার্জি।

ডাক-তার ধর্মঘটের ষষ্ঠ দিন থেকে কলকাতার সঙ্গে দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, মিরাট, আলিগড়, এলাহাবাদ সর্বত্র ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে টেলিগ্রাফ কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দিলেন। ১৬ জুলাই সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এক বিবৃতিতে সরকারি ঔদাসীন্যের নিন্দা করলেন। অল ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মৃণালকান্তি বসু সরকারকে এক নোটিশ দিয়ে বললেন, ২১ জুলাইয়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২১ জুলাই থেকে ডাক-তার দফতরের সব বিভাগও অচল হয়ে যাবে।

ভারত সরকার ১৮ জুলাই এক প্রেস নোটে জানাল, তারা অন্তর্বর্তী সাহায্য দিতে রাজি, আর একটা পে-কমিশন গঠন করার কথা বিবেচনা করবেন। কিন্তু ডাক-তার কর্মচারীরা এই সব প্রতিশ্রুতিতে ভুলতে রাজি হলেন না। ২১ জুলাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ও ডাক-তার কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির সভাপতি রূপে মৃণালকান্তি বসু ঘোষণা করলেন ২১ জুলাইয়ের মধ্য রাত্রি থেকে ধর্মঘট শুরু হবে। ২১ জুলাই রবিবার রাত ১২টার পর ভারতবর্ষের সঙ্গে কলকাতা মহানগরী গভীর নিশীথে মৃতের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অচল হয়ে গেল টেলিফোন ব্যবস্থা। বোম্বাইতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে স্থানীয় সব কলকারখানার শ্রমিকরা এক দিন ধর্মঘটে যোগ দিয়ে ডাক-তার কর্মচারীদের প্রতি সমর্থন জানাল। অনুরূপ ধর্মঘট মাদ্রাজে ২৩ জুলাই। ২৪ জুলাই মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে বিপিটিইউসি-র জেনারেল কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনে জনগণের প্রতি 'নিঃসংশয় সহানুভূতি ও সমর্থন' জ্ঞাপনের জন্য বাংলার সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়কে ২৯ জুলাই সোমবার এক দিনের জন্য সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট পালনের নির্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রকার সিদ্ধান্তের তাৎপর্য ও গুরুত্বের অবধি নেই, এ একটি বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত, এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল সাধারণত সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, ছাত্র আন্দোলনে, শ্রমিক আন্দোলনে, বিপ্লববাদী আন্দোলনে কলকাতা এবং বাংলা বার বার নেতৃত্ব দিয়েছে। সৃষ্টি করেছে অত্যন্ত বিশিষ্ট অবদান, বার বার রচনা করেছে নতুন পথ, সৃষ্টিমূলক যুগান্তকারী ঘটনার জন্ম দিয়ে আন্দোলনকে বার বার এক দিনে হয়তো এক মাসের পথ পার করিয়ে নিয়ে গেছে। করেছে তাকে বৃহত্তর স্তরে উন্নীত।

২৯ জুলাই তারিখেও কলকাতার জনসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করল। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে এ দিনটা চিরকাল জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। সন্দেহ নেই নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাংলা শাখার আহ্বানে সে দিন ধর্মঘটীদের প্রতি পরিপূর্ণ এবং সক্রিয় সহানুভূতি জানানোর জন্য কলকাতা, হাওড়া ও আশপাশের শিল্পাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় তাদের কাজের চাকা গুটিয়ে নিয়েছিল। চারপাশের বিরাট কর্মচাঞ্চল্য যেন

মন্ত্র-শান্ত-ভুজঙ্গের গতি, একটি দিনের জন্য ধর্মঘট এবং জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কলকাতা ও ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। সার্বজনীন জাতীয় প্রতিবাদের এই অনন্যসাধারণ অভিব্যক্তির ফলে এ দিন সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আধুনিক জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে সর্ববিধ কর্মতৎপরতার সম্পূর্ণ বিরতি ঘটে। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা, গরু-মহিষের গাড়ি—কোনওরূপ যানবাহনই কলকাতার রাস্তায় দেখা গেল না। হিন্দু-মুসলমান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, জৈন, শিখ, খ্রিস্টান অথবা এশিয়বাসী কলকাতা উপকণ্ঠের অগণিত দোকানের মালিক ও হাটবাজার সমূহের দোকানদারগণ যিনিই হন না কেন, সবাই নিজ থেকেই আপন আপন দোকান বন্ধ রাখেন। এমনকী ইউরোপীয়দের হোটেল, রেস্টুরেণ্ট ও বিভিন্ন দ্রব্যের বিপণিগুলিও বন্ধ রাখা হয়। কর্মচঞ্চল ডালহৌসি স্কোয়ার, ক্লাইভ স্ট্রিট ও সন্নিহিত অঞ্চলের বড় বড় ভারতীয় ও ইউরোপীয় অফিসসমূহ এবং নগরী ও উপকণ্ঠের ক্ষুদ্র, বৃহৎ অসংখ্য অফিস এ দিন জাতীয় হরতালের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পর্যন্ত কর্মগুঞ্জন থেমে যায়। উচ্চপদস্থ ১০/১২ জন মাত্র কর্মচারী কোনও মতে ঢুকেছিলেন। কলকাতায় খেলার মাঠে সব খেলা বন্ধ ছিল। নগরী ও উপকণ্ঠের সমস্ত সিনেমা ও থিয়েটার বন্ধ ছিল। শিল্পী ও বক্তারা যোগদান না করায় কলকাতায় বেতার কেন্দ্রে নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসৃত হতে পারেনি। অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সমস্ত দৈনিক ও সাময়িক পত্রের কার্যালয়ই বন্ধ ছিল। রেল শ্রমিকদের এই ধর্মঘট থেকে বাদ দেওয়া হলেও জনসাধারণেরই আপত্তিতে আশপাশের রেল চলাচলে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়। মহানগরীতে রাত্রি নামলে শহর ও উপকণ্ঠের প্রধান ও অপ্রধান রাস্তাগুলিতে অধিকাংশ গ্যাস ও ইলেকট্রিক লাইটই নির্বাপিত থাকতে দেখা যায়। এ দিন ভোরবেলা থেকে বেশ রাত্রি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে লরিযোগে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে টহল দিতে দেখা যায়। কিন্তু হরতাল এমন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পালিত হয় যে, কোথাও কোনও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়নি।

দ্বিপ্রহরে ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে লক্ষ লক্ষ লোকের এক বিশাল জনসমাবেশ হয়, সমগ্র ময়দান এক বিশাল জনসমুদ্রের আকার ধারণ করে। ডাক-তার ও টেলিফোন ধর্মঘটে সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য শহর ও

শহরতলির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ছোট-বড় শোভাযাত্রা এসে যোগদান করে। বৃহত্তর কলকাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিকের এই অবিস্মরণীয় জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মৃণালকান্তি বসু। এই সমাবেশে আর যাঁরা বক্তব্য রাখেন, তাঁরা হলেন ড. আব্দুল খালেক, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. চারুচন্দ্র ব্যানার্জি, শিবনাথ ব্যানার্জি, হেমন্তকুমার বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

২৯ জুলাই ঐতিহাসিক সর্বাত্মক ধর্মঘট এবং সেই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দেশবাসীর বিপুল সমর্থন প্রতীকরূপে পরিণত হল। ২৯ তারিখে ধর্মঘটের পর মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, শরৎচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ধর্মঘটীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বললেন, দেশে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অচল অবস্থা অবসানে ডাক-তার কর্মচারীরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

ডাক-তার কর্মচারীদের দাবি আদায়ে এগিয়ে এলেন বাংলার সুরাবর্দি। সকলে বললেন, আপনারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিন। আপনাদের লড়াই আমাদের লড়াই। ৭ আগস্ট ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল মৃণালকান্তি বসুর এক আবেদনে। ডাক-তার, টেলিফোনসহ সমস্ত ধর্মঘটী কর্মচারীদের তিনি কাজে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। ১৬ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘটের অবসান হল। স্বাধীনতার ঠিক আগের বছরেই ঐতিহাসিক ডাক ও তার ধর্মঘট সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজ তরান্বিত করেছিল।

সূত্র: কৃত্তিবাস ওঝা, ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের প্রকাশনা: মৃণালকান্তি বসু, এ ট্রিবিউট থেকে সংগৃহীত

নৌবিদ্রোহ
১৯৪৬

১৯৪৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজের কামানের গর্জন, নৌবিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্র নওজোয়ানদের অসম সাহসিকতাপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের যে আগুন থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের সূচনা তারই অন্যতম বহিঃপ্রকাশ নৌসেনানীদের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বের রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটল। জাপান ও জার্মানির পরাজয় এবং মিত্রশক্তির বিজয়ের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মনে করল তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন আছে। যুদ্ধ শেষে সেনাবাহিনীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তারা ভুলতে বসেছে। অন্য দিকে সেনাবাহিনীর সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। নৌবাহিনীতে যুদ্ধপর্বে ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণির জাহাজ, ১২০০ নৌসেনা আর ১০০ ভারতীয় অফিসার মাত্র ছিল। সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৌসেনা বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হয়েছিল। যুদ্ধশেষের পরে এক দিকে যেমন সেই সব প্রতিশ্রুতি সামরিক কর্তৃপক্ষ ভুলে যায়, অন্য দিকে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে পুনরায় অমানবিক ব্যবহার হয়।

নৌসেনারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 'তলোয়ার' যুদ্ধজাহাজের কয়েকজন নৌসেনা খাদ্যের বদলে অখাদ্য দেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিলেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট। ব্রিটিশ নৌ অফিসাররা উত্তর দিয়েছিল— 'ভিখারির আবার পছন্দ'। যারা সেই অখাদ্য গ্রহণে অস্বীকার করল, তাদের শাস্তি হল অতিরিক্ত খাটুনির আদেশ। এর পরেও ভারতীয় নৌসেনারা ধৈর্যচ্যুত না হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাল। কিন্তু কোনও সুবিচার পাওয়া গেল না, বরং আরও অপমানের মাত্রা বাড়ল। প্রতিকারের অন্য কোনও পথ না পেয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌসেনারা সিদ্ধান্ত করলেন তারা ধর্মঘট করবেন। ইতোপূর্বে বিমানবাহিনী ধর্মঘট করে দাবি আদায় করেছে। বিমানবাহিনীর ধর্মঘট থেকেও তারা প্রেরণা পেয়েছিল। তলোয়ার জাহাজে ধর্মঘট শুরু হল ২১ ফেব্রুয়ারি।

সেনাবাহিনীর এই শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পাঁচদিন চলল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অটল। নৌসেনাদের দাবি মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, শিক্ষার্থীদের শিবিরগুলিতে সামরিক পাহারা বসানো এবং 'তলোয়ার' ও অন্যান্য শিবির থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলা হল। কিন্তু ধর্মঘটীরা ক্যাসেল ব্যারাক ও জাহাজগুলোয় গার্ডরুম দখল করে রইলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা কিছু ধর্মঘটী নৌসেনা খাদ্যের অন্বেষণে বাইরে বেরিয়ে ব্রিটিশ বুলেটে নিহত হয়। সকাল ৯টা থেকে অ্যাডমিরাল গডফ্রের নেতৃত্বে ক্যাসেল ব্যারাকের দিকে নিশানা থেকেই কামান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হল। মরিয়া ভারতীয় বিদ্রোহী নৌসেনারাও পাল্টা কামানের গর্জনে প্রত্যুত্তর দিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরু হল সশস্ত্র সংগ্রাম। কামানের এই গর্জন শুধু ক্যাসেল ব্যারাকেই সীমাবদ্ধ রইল না। বন্দরের নিকটবর্তী জাহাজ থেকে আরও কামান, আরও বন্দুক গর্জন করে উঠল। বোম্বাইয়ের আগুন ছড়িয়ে পড়ল করাচি, পুনা, কলকাতায়। 'সিন্ধু', 'পঞ্জাব', 'হিন্দুস্থান', 'অযোধ্যা', 'নর্মদা' প্রভৃতি আরও অনেক জাহাজে নৌসেনারা বিদ্রোহ করল।

২১ ফেব্রুয়ারি নৌসেনারা যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল— ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণ তাকে চালিয়ে নিয়েছে— এগিয়ে দিয়েছে। জনশক্তি ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে গড়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মেলবন্ধন। নতুন এক ইতিহাসের সূচনা ঘটল। বিদ্রোহী সেনারা অনুভব করল কোটি কোটি ভারতবাসী তাদের সমর্থন করছে।

বিদ্রোহী নৌসেনারা শেষ পর্যন্ত বিরাট শক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সমকক্ষ হতে পারেনি, ঠিক সেই কারণেই আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গেল। পাশাপাশি নৌবিদ্রোহ যে শিক্ষা দিয়ে গেল— আপোষ আলোচনা ও আইনগত সংস্কারের পথে ইতিহাস গড়ে ওঠে না। ইতিহাস গড়ে ওঠে বিপ্লবী জনসাধারণের সংগ্রামের পথে।

চটশিল্পে ধর্মঘট ও আন্দোলন

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ১০ বার বোনাসের দাবিতে শিল্পভিত্তিক এক দিনের ধর্মঘট হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ৫০ হাজার চটকল শ্রমিক কলকাতার ইণ্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন দফতরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৯৬৯ সালে প্রথম গঙ্গার দু'পারে সমস্ত চটকল শ্রমিকরা এক সঙ্গে ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের ৪ অগস্ট থেকে ১১ অগস্ট ৮ দিন ব্যাপী চটকল শ্রমিকরা লাগাতার ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির বিষয়টি নিয়ে এই সময়ে ধর্মতলায় শহিদ মিনার ময়দানে লক্ষাধিক চটকল শ্রমিকের সমাবেশ হয়েছিল। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পুনরায় ধর্মঘট হয়েছিল। চুক্তি হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে চটশিল্পে ২১ দফা দাবি নিয়ে ৫০ দিন ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের চটকল শ্রমিকরা ৮৪ দিন লাগাতার ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯৮৬সালে চটব্যাগ ব্যবহারের দাবিতে এবং সিন্থেটিক ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চটকল শ্রমিক ও গ্রামীণ পাট চাষিরা মিলে গ্রামে একদিনের ধর্মঘট করেছিলেন। ২০০২ সালে চটশিল্পে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাবিসনদ প্রস্তুত করে আন্দোলনে নামে। ২০০৪ সালে পুনরায় লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। ২০০৯ সালে ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২০টি ইউনিয়ন

ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। তা ছাড়া ডক শ্রমিকরা, বন্দর শ্রমিকরা, চা-বাগানের শ্রমিকরা তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন ও ধর্মঘটের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।

শ্রমিক ঐক্যের নতুন অধ্যায়

১৯৯৫ সাল উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিক ঐক্যের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে হয়ে চলা শ্রমিক বচসার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তা সংগঠিত রূপ ধারণ করতে ১৯৫২ সালের শেষ দিকে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এআইটিইউসি'র কনভেনশন থেকে আইএনটিইউসি, এইচএমএস ও ইউটিইউসি'র কাছে বার্তা পাঠানো হল এআইটিইউসি'তে পুনরায় যোগ দিয়ে তাকে ভারতের একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। এই কনভেনশনের কিছুদিন পরেই এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একটি সভায় মিলিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ইউটিইউসি'ই কেবলমাত্র এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐক্য আলোচনার সভায় আসে। কিন্তু ঐক্য আলোচনাটি শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। যদিও শ্রমিক শ্রেণির উপরে কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ প্রতিরোধে এআইটিইউসি ও ইউটিইউসি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সংযুক্তিকরণ সম্পর্কিত আলোচনা

১৯৪৯ সালে এআইটিইউসি বিভাজনের পর ইউটিইউসি গঠিত হয়। এই বিভাজন ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। এআইটিইউসি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইউটিইউসি নেতৃত্বও মনে করেছিলেন পুনরায় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। সেই অনুভব থেকেই সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব।

১৯৫৩-র ২৫ জুন ইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদকের বাসভবনে অত্যন্ত সৌহার্দ্যমূলক উষ্ণতায় কমরেড এস এ ডাঙ্গে, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, রণেন সেন, যতীন চক্রবর্তী এবং মৃণালকান্তি বসু দীর্ঘক্ষণ সংযুক্তিকরণের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী আলোচনা চলা সত্ত্বেও কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ দু'টি সংগঠনের

জেনারেল কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবটিকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এই সিদ্ধান্তটিকে পূর্ণ সম্মতিতে অনুমোদন করানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩-র ১৭ আগস্ট ইউটিইউসি-র জেনারেল কাউন্সিল আহুত হয়। সেই সভায় কেরল এবং বোম্বের কয়েকজন কমরেড এ দু'টি রাজ্যে এআইটিইউসি-র আধিপত্যমূলক ব্যবহার এবং ইউটিইউসি-র কমরেডদের সঙ্গে অহেতুক তিক্ততার প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সে মুহূর্তে সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে কয়েকটি জটিলতা উপস্থিত হয়। খুব ধীর স্থির পদক্ষেপ নিয়ে, সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করেই জেনারেল কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সংযুক্তিকরণের বিষয়ে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এআইটিইউসি-র মধ্যেও প্রয়োজনীয় নমনীয়তার অভাব ছিল।

ঐক্যের প্রচেষ্টা ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

১৯৫৩ সালে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ চলাকালীন বার্নপুরে আইআইএসসিওতে বোনাসের দাবিতে শ্রমিকরা এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। আইআইএসসিও-র শ্রমিকদের এই আন্দোলন ভাঙার জন্য মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মিছিলে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়। কিন্তু শ্রমিকরা গুণ্ডাদের ভাগিয়ে দেয়। তখন পুলিশ এসে শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এই গুলিবর্ষণে সাতজন শ্রমিক নিহত হন। বার্নপুরে এই নির্মম শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে আসানসোলে ৬ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ১৫ জুলাই শ্রমিক হত্যাকাণ্ড এবং কলকাতার ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিপিটিইউসি, এইচএমএস, ইউটিইউসি এবং অন্যান্য কর্মচারী ফেডারেশনগুলি মিলিত ভাবে সাধরণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়।

ছাঁটাই ও বেকারি

বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকেই বিরাট সংখ্যার শ্রমিক ও কর্মচারী ছাঁটাই হতে থাকে। ১৯৫১-৫২ ও ৫৩ সাল নাগাদ এই ছাঁটাইয়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে থাকে। বিপিটিইউসি, এইচএমএস, ইউটিইউসি এবং কর্মচারী ফেডারেশনগুলির মিলিত আহ্বানে এলাকায় এলাকায় এবং রাজ্যব্যাপী কেন্দ্রীয় ভাবে ছাঁটাই এবং বেকারি বিরোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।

এআইটিইউসি ভেঙে আইএনটিইউসি গড়ে ওঠার পর থেকে কারখানা মালিক ও সরকারের প্রচেষ্টা ছিল আইএনটিইউসি'কে শক্তিশালী করা। ১৯৫০ সালের পর থেকে ইউটিইউসি পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানে বিশেষ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছিল এবং প্রেসের কর্মচারীদের, চটকলের এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এই অংশের শ্রমিকদের সংঘঠিত করতে পেরেছিল। এইচএমএস অবশ্য চা বাগান ও কয়লা শিল্পে সংগঠন বাড়াতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শ্রমিকদের বেতন ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে কম। বোম্বের একজন অদক্ষ শ্রমিকের বেতন ছিল ৯১ টাকা ১২ আনা, আমেদাবাদে ৭৮ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে পুরুষ সুতাকল শ্রমিক পেত ৫০ টাকা ১৫ পয়সা আর মেয়ে শ্রমিক পেত ৪৫ টাকা ১২ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গে ৭টি সুতাকল— বাসন্তী, বাউরিয়া, ডামবার, কেসোরাম, বঙ্গলক্ষ্মী, রামপুরিয়া এবং মোহিনী ১৯৫০ সালে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মূলধনের উপর ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার অর্থাৎ শতকরা ১৪ ভাগের উপর মুনাফা করেছে। ওই একই বছর বোম্বের সবচেয়ে বড় ৪টি বোম্বে ডায়িং, সেঞ্চুরি, ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ও কোহিনির ১০ কোটি মূলধনের উপর ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২২ শতাংশ হারে মুনাফা করেছে। অথচ, দক্ষতা কম এই অজুহাত দেখিয়ে বোম্বের শ্রমিকের চাইতে পশ্চিমবঙ্গের সুতাকল শ্রমিক মাসে ৪১ টাকা থেকে ৫০ টাকা কম পেত।

১৯৫৩ সালে বোনাস আন্দোলনের ব্যাপকতায় আইএনটিইউসি'র শ্রমিকরা এতে যোগদান করেছিল। বিপিটিইউসি, এইচএমএস ও ইউটিইউসি'র আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গে বোনাসের দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বরে এক দিনের শিল্প ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘটে চটকল শ্রমিক, সুতাকল শ্রমিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা যোগদান করেন। রানিগঞ্জ পেপার মিল শ্রমিকরা ১৯৫৩ সালে ১৭ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হয় ওয়েলিংটন জুটমিল, রিলায়েন্স জুটমিল ও ওরিয়েন্ট জুটমিলে ২৪ মার্চ। কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিকরা ২৭ মার্চ থেকে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে এবং মহার্ঘভাতার দাবিতে ধর্মঘট করেন। ২ ডিসেম্বর ৩ হাজার দর্জি ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেন। আটজন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্বহাল, চার মাসের বোনাস, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আঠারো দফা দাবির ভিত্তিতে টিটাগড় পেপার মিলের আড়াই হাজার শ্রমিক ৫০ দিন যাবৎ লাগাতার ধর্মঘট করেন।

ওই বছরই ৮ ডিসেম্বর আটজন দাঁড়ি মাঝির উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে 'বেঙ্গল মেরিনার্স' ইউনিয়নের ডাকে কলকাতা বন্দরে ১৮ হাজার দাঁড়ি মাঝি এক দিনের ধর্মঘটে শামিল হন।

১৯৫৩-৫৪ সালে, বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে যে কয়টি ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, উল্লেখযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট ছিল রানিগঞ্জ রিফ্র্যাক্টারি অ্যাণ্ড সিরামিক কারখানার শ্রমিকদের ৮ মাস ব্যাপী ধর্মঘট।

২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সালে ধর্মঘট শুরু হয়। অনির্দিষ্টকাল এই ধর্মঘট চলতে থাকে, কারণ কারখানার মালিক স্যার বীরেন মুখার্জি কোনও রকম মীমাংসায় রাজি হননি। ধর্মঘটীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২০ নভেম্বর সকাল থেকে পদযাত্রা করে কলকাতায় এসে বিক্ষোভ দেখাবেন।

সমস্ত রানিগঞ্জের অবস্থাটা থমথমে হয়ে উঠল। ৮ মাস ধর্মঘট চলার পর ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ধর্মঘটী শ্রমিকদের একাংশকে পায়ে হেঁটে কলকাতার মার্টিন বার্ন কোম্পানির অফিসের সামনে ধরনা দেওয়া হবে। ২০ নভেম্বর সকালবেলা পথচলা শুরু, যা শেষ হয় ২ ডিসেম্বর কলকাতার মার্টিন বার্ন কোম্পানির সামনে এসে। এই ১১ দিন অভুক্ত, অর্ধভুক্ত জীর্ণ-শীর্ণ শ্রমিকরা ৮ মাস ধর্মঘটের পর ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করেন।

চা শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন

১৯৫২ সালে ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ভারত সরকার কলকাতায় একটি নির্দলীয় বাগিচা শিল্প সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ও পরবর্তী কালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু এই সম্মেলনে এআইটিইউসি ও ইউটিইউসি-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

১৯৫২ সালের মধ্যে ভারতের চা-বাগানের ভিতর ১২০টি বাগান হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, না হয় বন্ধ হওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন 'সত্যযুগ' পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালের সংখ্যায় জানানো হয়, ওই বাগানগুলির সবই ছিল অসম ভ্যালি, সুরমা ভ্যালি, দার্জিলিং তরাই, ডুয়ার্স ও ত্রিপুরায়। এই ১২টি বাগান বন্ধ হওয়ার ফলে অন্তত ১ লাখ শ্রমিক সম্পূর্ণ বেকার ও দুঃস্থ হয়ে গিয়েছিল। (সূত্র: শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য প্রসঙ্গে, মনোরঞ্জন রায়)

ছাঁটাই ও বেকারি সমস্যা

মহাযুদ্ধের পরে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৫০ লক্ষ মানুষকে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছিল। তা ছাড়া ২০ লক্ষ লোকের চাকরি যায় সামরিক বাহিনী থেকে। ১৯৪৫—১৯৫২ সাল এই সাত বছর নতুন চাকরি ব্যবস্থা খুব সামান্যই হয়েছে।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর এই চার মাসে ৩৮ লক্ষের উপর কর্মরত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিলেন। এই সময়কালে তিন সপ্তাহে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে ৮০ হাজার মেহনতি মানুষ ছাঁটাই হয়ে যায়। সাপ্তাহিক কাগজ 'মতামত'-এর ২০ জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালের সংখ্যায় সারা ভারতের ছাঁটাইয়ের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়—

১. সারা ভারতে নিযুক্ত তাঁতশিল্পে তন্তুবায়— ২৭ লক্ষ ২. চিরাকুল্লের কাঠুনি শ্রমিক— দেড় লক্ষ ৩. ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের মজদুর— ১ লক্ষ ৪. অসম, বাংলা, ত্রিপুরার চা-শ্রমিক— ১ লক্ষ ৫. মাদ্রাজ খাদি উৎপাদনকারী তন্তুবায়— ১ লক্ষ ৬. পশ্চিমবঙ্গের চটকল শ্রমিক— ৩০ হাজার ৭. বিহারের লাক্ষা শ্রমিক ২০ হাজার ও লাক্ষা কৃষক ৭ লক্ষ ৮. বিহারের অভ্র শ্রমিক কয়েক হাজার ৯. পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ৫ হাজার।

ওই সংখ্যার 'মতামত' কাগজে আরও উল্লেখিত হয় 'প্রতিদিনই শত শত মানুষকে ছাঁটাই আর বেকারির যূপকাঠে বলি দেওয়ার কাজ অব্যাহত গতিতে চলেছে। কিন্তু কত শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বলি হয়েছিল তার সঠিক হিসাব সরকারের দফতরে পাওয়া যায় না।'

বিপিটিইউসি'র উদ্যোগে ২ জানুয়ারি ১০৯টি ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা এবং অন্যান্য গণসংগঠনের তিনশো প্রতিনিধি এক সভায় মিলিত হয়ে ১৯৫৩ সালে ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যভিত্তিক ছাঁটাই ও বেকারি বিরোধী সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সভা থেকেই ইউটিইউসি-র প্রতিষ্ঠাতা মৃণালকান্তি বসুকে সভাপতি করে ৩০ জন সদস্য নিয়ে ২১-২২ তারিখের সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

বরানগরে অনুষ্ঠিত ৮ ফেব্রুয়ারি ছাঁটাই বিরোধী একটি স্থানীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দেন আইএনটিইউসি নেতা অনিল বসু, বিপিটিইউসি'র নেতা কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরি এবং ইউটিইউসি'র প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মৃণালকান্তি বসু।

বহরমপুরের মণীন্দ্র মিল সুতাকলের ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি খাগড়া বয়েজ হাইস্কুলের ও বহরমপুর ট্রেনিং অ্যাকাডেমির সমস্ত ছাত্র ধর্মঘট করে। ছাত্র শ্রমিক ঐক্যের এটা একটা নজির ছিল।

ঐক্যবদ্ধ সম্মেলন

১৯৫২ সালের বেকারি এবং ছাঁটাই-বিরোধী তীব্র আন্দোলনের শীর্ষে দাঁড়িয়ে ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে প্রতিনিধি সম্মেলন এবং ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৩৭টি গণ সংগঠনের ৭৮৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিনে। ওই ২৩৭টি গণ সংগঠনের মধ্যে ১৮৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, বাকি ৪১টি ছিল কৃষক, যুব, ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা, বস্তিবাসীদের সংগঠন, উদ্বাস্তু সংগঠন প্রভৃতি। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইউটিইউসি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মৃণালকান্তি বসু।

ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ইউনিয়নের স্বীকৃতি ১৯৪৯ সালে বিলাতি ট্রাম কোম্পানি প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৫২ সালে ট্রামের ৯২ হাজার শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের সভ্য ছিল ৮,৫০০ এবং প্রতি মাসে পাঁচ হাজারের বেশি শ্রমিক চাঁদা দিতেন। ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে ৮০৬৫ জন শ্রমিক গণ দরখাস্তে সই দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ মালিক তাতেও ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র স্বীকার করতে রাজি হয় না।

এ ছাড়া ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে কোম্পানি ইউনিয়নের নেতা-কর্মী, স্থানীয় নেতা শ্রমিককে ছাঁটাই করে দিয়েছিল। ট্রামের শ্রমিকরা ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালের বিভিন্ন সময়ে বড় বড় সভা, শোভাযাত্রা, গণ দরখাস্ত প্রভৃতি মারফত কোম্পানি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৪ মার্চ ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল ট্রাম কোম্পানির হেড অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল, সোমনাথ লাহিড়ী, ধীরেন মজুমদার, নৌরতন সিং প্রমুখ। সমগ্র শোভাযাত্রাটিকে পুলিশ সামনে পিছনে ঘেরাও করে রেখেছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে শ্রমিকরা

ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করলেও ইংরেজ ম্যানেজার শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ম্যানেজারকে বের করে নিয়ে যায়। শ্রমিকরা পরে ওখান থেকে কার্জন পার্কে গিয়ে জমায়েত হন এবং সন্ধ্যা ৬টার সময় চার হাজারের বেশি শ্রমিক শোভাযাত্রা করে বিধানসভা অভিমুখে রওনা হন। শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রথমে শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন। শ্রমিকরাও অনড় হয়ে বিধানসভার পশ্চিম গেটে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে রাত আটটার সময় শ্রমমন্ত্রী শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন। অবশ্য শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হলেও শ্রমিকদের দাবিসমূহের সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যায়নি। ফলে ট্রাম শ্রমিকরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সভা শেষ করেন।

চা-শিল্পে ধর্মঘট

বাগিচা শ্রমিক আন্দোলন

১৯৫৫ সালে উত্তরবঙ্গে চা-বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমিক ঐক্যের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়। বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য অধিকারের দাবিতে ২২ জুন শুরু হয়েছিল দার্জিলিং জেলার চা-বাগানে শ্রমিক ধর্মঘট আর ২২ আগস্ট থেকে বেনাসের দাবিতে শুরু হয় ডুয়ার্সের বাগিচা শ্রমিকদের ধর্মঘট। তরাইয়ের শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। অসম সীমান্ত থেকে শুরু করে তরাই এলাকা পর্যন্ত দুই লক্ষ চা বাগিচা শ্রমিকদের ধর্মঘট কার্যত এক গণ অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। এই ধর্মঘটের ইতিহাস ফিরে দেখার আগে স্বাধীনতার পরবর্তিকালীন ডুয়ার্স, তরাই, দার্জিলিংয়ের চা-শ্রমিকদের আর্থিক-সামাজিক অবস্থা বিবৃত করা প্রয়োজন। বাগিচা শ্রমিকদের উপরে ব্রিটিশ মালিকদের (সহযোগী ছিল ভারতীয় মালিকরাও) অত্যাচারই ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের।

দার্জিলিংয়ের পাহাড় অঞ্চলে ১৯৫২-৫৩ সালে রেশনের দাম বাড়িয়ে শ্রমিকদের বেতন শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। '৫২ সালে প্রচণ্ড শীতের সময় একের পর এক বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর

বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সে দিন শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ মালিকপক্ষ এবং সরকার পুরোপুরি নিয়েছিল। এই অনৈক্য থাকার ফলে মালিক ও সরকারের আক্রমণের মুখে শ্রমিকরা অসহায় বোধ করছিল। সাধারণ ভাবে শ্রমিকরা নিজেরা নিজেদের সংগ্রামের দিশা তৈরি করে নিতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন হয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের সাহায্য। শ্রমিকরা মনে মনে উপলব্ধি করলেও ঐক্যের প্রশ্নটি তুলে ধরা কিংবা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঐক্য গড়ে তোলার দায়িত্ব হল নেতৃত্বের। শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন এবং স্থানীয় নেপালিদের সংগঠন গোর্খা লিগ পরিচালিত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐক্যের শর্ত ছিল কোনও ইউনিয়ন যৌথ সভায় পতাকা ব্যবহার করবে না অথবা 'জয় গোর্খা' বা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়া হবে না। দাযিত্বজ্ঞানহীন ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষতিকারক মন্তব্যে কখনওই ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে ওঠে না।

ঐক্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ১৯৫৫ সালের ২২ জুন থেকে দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে চা-বাগানগুলির শ্রমিকদের লাগাতার সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়।

১৯৫২-৫৩ সালে চায়ের দাম পড়ে গেছে, এই অজুহাতে বেশ কয়েকটি চা-বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখনকার অনাহার আর অনাহারজনিত মৃত্যুর তিক্ততম অভিজ্ঞতা দার্জিলিংয়ের শ্রমিকদের আছে। তারা দেখে নিয়েছে কীভাবে যে সরকার জনগণের সরকার বলে নিজেদের দাবি করে থাকে অভুক্ত শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার বদলে সেই সরকার মজুরি ছাঁটাই করেছে। তারা দেখেছে বাগান বন্ধ রেখে শত শত শ্রমিকদের ক্ষুধার মুখে ঠেলে দিয়েছে, আর একবারও সরকার শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। সর্বোপরি তারা এও দেখেছে যে, কীভাবে মালিকরা সব সময়ই শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়েছে।

বঞ্চনার ইতিহাস

১৯৫৩ সাল থেকে দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকরা দাবি করে আসছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়, তরাই, ও ডুয়ার্সের চা বাগিচায় বেতন কাঠামো

একই করতে হবে। দার্জিলিং পাহাড়ের পাদদেশেই অবস্থিত ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বেতন কাঠামোও খুব কম ছিল, কিন্তু ডুয়ার্স ও তরাইয়ের শ্রমিকরা যা পেত দার্জিলিংয়ের শ্রমিকরা তাও পেত না।

ন্যূনতম বেতন আইনের অধীনে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সময় কমিটি নিজেই দেখেছিল যে, দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের জীবনধারণের মূল্যস্তর প্রায় একই। বরং অপর দুই এলাকায় চেয়ে দার্জিলিংয়ের মূল্যস্তর একটু বেশিই ছিল। তাই মোদক কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিংয়ের বেতন কাঠামো একই হওয়া উচিত। কিন্তু সুপারিশ দেবার সময় একটি কমিটি ১৯৫১ সালে কোনও কারণ না দেখিয়েই হঠাৎ বলে বসল যে, দার্জিলিংয়ের শ্রমিকরা ডুয়ার্স ও তরাইয়ের শ্রমিকদের চেয়ে চার আনা রোজ কম পাবে।

তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একতরফা ভাবে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের চা-শ্রমিকদের বেতনের পার্থক্য বাড়িয়ে চলছিল। ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তরাই ও ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের দৈনিক বেতনের রূপ নীচে দেওয়া হল।

	পুরুষ			নারী			শিশু		
	টা	আ	প	টা	আ	প	টা	আ	প
দার্জিলিং পাহাড়	১	২	৬	১	১	৬	০	১১	৬
তরাই	১	১১	০	১	৯	০	১	২	০
ডুয়ার্স (পাঁচশো একরের বেশি বাগান)	১	১১	৬	১	৮	৬	১	২	৬

সুতরাং দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের শ্রমিকদের বেতনের তফাত ছিল রোজপ্রতি নয় আনা।

সঠিক ভাবে বলতে গেলে দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রমিকদের সংগ্রাম ছিল ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন ও বাজারে চায়ের দাম অনুযায়ী ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের নীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

ব্যাপক হারে যক্ষ্মা

সাধারণ ভাবে চা-শ্রমিকদের চূড়ান্ত কষ্টভোগ করতে হত, বিশেষত প্রতি

বর্ষাকালে, যা পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী। পাহাড়ি দুর্গমতার জন্য দার্জিলিংয়ের শ্রমিকদের অন্য অঞ্চলগুলির চেয়ে বেশি কষ্টভোগ করতে হত। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের প্রয়োজন ছিল পেটভরা খাবার ও কাপড়চোপড়, যাতে প্রবল শীতের কামড় তারা মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কাছে এ সবের কোনও গুরুত্ব ছিল না। তাদের একমাত্র গুরুত্বের বিষয় ছিল মুনাফা— বিশেষ করে ব্রিটিশ মালিকদের। দার্জিলিংয়ের শ্রমিকদের কঠিন পরিশ্রম ও অত্যন্ত নিচু জীবনযাত্রার মানই তাদের মধ্যে উচ্চহারে যক্ষ্মার মূল কারণ ছিল।

স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ও বোনাস

সকলেই জানেন যে, চা-বাগিচা এলাকায়, যেখানে শত শত মাইল এলাকা চা বাগিচা মালিকদের, যেখানে ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারত না, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল। কঠিন বাধার মধ্যেও সেই সময় চা-শ্রমিকরা ধীরে ধীরে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছিল। যখন বাগিচা মালিকরা শ্রমিকদের ইউনিয়নে যোগ দেওয়া আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন তারা স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সাহায্য নিয়ে কোনও না কোনও অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নের নেতাদের ছাঁটাই করেছে আর সপরিবারে তাদের বাগান-ছাড়া করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চা-বাগানের শ্রমিকদের অন্যতম দাবি ছিল স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন, যে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার মালিকদের যখন খুশি ছাঁটাই করার অধিকার দিয়েছিল।

সেই সময় দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাইয়ের সমস্ত চা শ্রমিকদের আরেকটি সাধারণ দাবি ছিল বোনাস। ১৯৫৩-৫৪ সালে চায়ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের অভূতপূর্ব মুনাফা শ্রমিকদের অজানা ছিল না। তারা আর নিজেদের অমানবিক জীবনযাত্রার মানে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি ছিল না। আগেকার পিছিয়ে-থাকা চা শ্রমিকদের চেতনা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে দিন উন্নত হয়েছিল। শ্রমিকরা তাদের বোনাসের দাবি মানতে সরকার ও মালিকদের বাধ্য করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল।

দার্জিলিংয়ের চা শ্রমিকরা আরও যে সব দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিল, তার মধ্যে ছিল বাগানের কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, ১৯৫৩ সালের

বেতন ছাঁটাইয়ের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।

দার্জিলিং পাহাড়ের বাগানগুলির ওই সময়কার মুনাফা ও কাজের জন্য ব্যয় ইত্যাদি খতিয়ে দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব কীভাবে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ইংরেজ মালিকদের ক্রমবর্ধমান মুনাফার হার আরও বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের চাপ দিচ্ছিল।

এ ঘটনাও দেখা যাবে যে, যেখানে দার্জিলিংয়ের চায়ের দাম সব সময়ই বেশি, সেখানে একই সঙ্গে প্রতি একরে ব্যয় দার্জিলিংয়েরই সবচেয়ে কম ছিল। সরকার ও বাগিচা মালিকরা নিজেদের সুবিধামতো এ সব কথা চেপে রাখত এবং চেষ্টা করত সাধারণ মানুষকে এই যুক্তি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে যে, এখানেই প্রতি একরে ফলন সবচেয়ে কম।

১৯৫৩ সালে প্রতি একরে কাজের গড়পড়তা ব্যয়: ডুয়ার্সের ২৩টি বাগানে ১,৩৩৫.৬৯ টাকা, তরাইয়ের ৮টি বাগানে ১,১৮৩.৭৫ টাকা (সূত্র: ইনভেস্টরস ইয়ার বুক ১৯৫৫)।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তিনটি অঞ্চলেই একরপিছু খরচ ১৯৫১ সাল থেকে ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। দার্জিলিংয়ের বাগানগুলির উদাহরণে বোঝা যাবে যে, এ হল বাগিচা মালিকদের মুনাফার আর একটি উৎস।

একরপিছু গড়পড়তা খরচের হার: ১৯৫১ সালে ৯২৫.২ টাকা, ১৯৫২ সালে ৮৯২.৫ টাকা, ১৯৫৩ সালে ৭৫০.৮৫ টাকা।

১৯৫৫ সালের ২২ জুন থেকে দার্জিলিং চা বাগানগুলিতে ধর্মঘট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হন বিপিটিইউসি-র সহসম্পাদক মনোরঞ্জন রায়, আনন্দ পাঠক, সাংদোপাল লেপচা, তামাং দাওয়া লামা, এস বি রায়, রাজেন সিনহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ধর্মঘট প্রস্তুতির ইতিহাস

প্রায় শতাব্দীকাল জুড়ে চা শ্রমিকরা অর্ধ-ক্রীতদাসের জীবনযাপন করে এসেছে। দেশজোড়া আন্দোলনের প্রভাব তাদের ওপরেও পড়ে এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে চা-শ্রমিকরা সংগঠিত হতে শুরু করে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য শিল্প শ্রমিকদের মতোই, চা সম্রাটদের অমানুষিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের অসংগঠিত অবস্থা এবং অনৈক্যই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, কয়েকটি বাগানে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হয়েছে, কিন্তু কখনওই ব্রিটিশ মালিকদের বিরুদ্ধে এ রকম ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়নি।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের দাবিগুলি ছিল: (ক) ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের জন্য চার মাসের বোনাস (খ) স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সংশোধন (গ) ১৯৫২ সালের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন চা-বাগানে সম্প্রসারিত করা (ঘ) বিভিন্ন বাগানের ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনর্বহাল। যদিও এই দাবিগুলি যুক্ত ভাবে পেশ করা হয়নি, কিন্তু পৃথক ভাবে প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নই এই দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

১৯৫২—৫৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি পৃথক পৃথক ভাবে উপরিউক্ত দাবিগুলিতে প্রচার চালাচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে বাগিচা এলাকা হাসিমারায় বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে ইউটিইউসি নিয়ন্ত্রিত ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বোনাসের দাবি উত্থাপন করা হয়। কালচিনি, বীরপাড়া শুধু নয়, কুমারগ্রাম ও জয়ন্তী থেকেও শ্রমিকরা এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। সম্মেলনের পরেই চা-শ্রমিকদের বোনাসের দাবি ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ চা সম্রাটরা তাদের অধঃস্তন সঙ্গী ভারতীয় চা-করদের সহযোগিতায় এ বিষয়গুলিতে চুপ করেছিল আর বিভিন্ন বাগানে ছাঁটাই চালিয়ে যাচ্ছিল। সহযোগিতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি সরকার। যখন সব কয়টি ইউনিয়ন ধর্মঘটের নোটিশ দিল, সরকার আলাপ-আলোচনার জন্য এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকল ১৬ আগস্ট অর্থাৎ, যে দিন ধর্মঘট শুরু হওয়ার কথা। এই মিটিংয়ে চা-মালিকরা শ্রমিকদের সব কয়টি দাবিতেই শুধুমাত্র 'না' বলে দিল। সরকার চুপ করে রইল। চা মালিকরা ও সরকার বিষয়গুলিকে বাগিচা শ্রমিকদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির কাছে পাঠাল। উপরিউক্ত স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিংয়ে বাগিচা মালিকরা একগুঁয়ে মনোভাব ছাড়ল না। এবং বাগিচা মালিকরা বা সরকার কেউই আশ্বাস দিল না যে তারা দাবিগুলি বিশেষত বোনাস সম্পর্কে বিবেচনা করতে রাজি আছে। কাজেই শ্রমিকদের কাছে তাদের আগেকার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না। ইউটিইউসি-র ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অবশ্য প্রথমে ১৬ আগস্ট থেকেই ধর্মঘট শুরু করার কথা বলেছিল। কিন্তু যেহেতু ১৬ আগস্ট ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই কারণে কমিটি কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা

বিবেচনার জন্য ওই দিন থেকে ঘোষিত ধর্মঘটের তারিখ ৭ দিন পিছিয়ে দিয়ে ২২ আগস্ট থেকে ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ওই দিন থেকেই ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হল। এআইটিইউসি ও এইচএমএস ২৯ আগস্ট থেকে এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। এ ভাবেই ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা-শ্রমিকদের বৃহত্তর ধর্মঘট শুরু হল সর্বাধিক শক্তিশালী মালিকদের বিরুদ্ধে। ইউটিইউসি-র আহ্বানে চা শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু হয়ে যাওয়ার পর কার্যত অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলিও শ্রমিকদের চাপের মধ্যে পড়ে যায়।

চা মালিকদের মুনাফা

ডুয়ার্স ও তরাই এলাকার চা শ্রমিকদের ধর্মঘট যে যুক্তিসঙ্গত ছিল, তা নিম্নোক্ত হিসেব থেকে বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগিচা মালিকরা ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে এত বিপুল পরিমাণে মুনাফা করেছিল যে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রীকেও বিধানসভায় স্বীকার করতে হয়েছিল যে, 'চা বাগিচাগুলি ১৯৫৪ সালে বিপুল লাভ করেছে।' কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করলে দেখা যাবে ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে কী পরিমাণ মুনাফা তারা করেছিল।

১৯৫৪ সালে ডুয়ার্সের তেইশটি ব্রিটিশ মালিকানার বাগান, যার মোট পুঁজিই ছিল ১,৮২,৬৭,৮০০ টাকা, লাভ করেছিল ১,৪৬,০৬,৩৭৭ টাকা। তরাইয়ের নয়টি বাগান, যার মোট পুঁজি ছিল ৩৩,৭৫,০০০ টাকা, লাভ করেছিল ওই একই বছরে ৩৪,২০,০২৮ টাকা। ভারতীয় মালিকরাও ব্রিটিশ একচেটিয়াপতিদের থেকে পিছিয়ে ছিল না।

ডুয়ার্সের বাগিচার মতোই তরাই ও দার্জিলিংয়ের বাগানগুলিরও মুনাফা ১৯৫৪ সালে একই রকম বেড়েছে। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে বাগিচা মালিকরা কোনও বোনাস দেওয়ার মতো আর্থিক অবস্থায় আছে কি না! কারণ ১৯৫৩ সাল থেকে ফেলে রাখা প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট চালু করলে নাকি তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হত।

ঐক্য গড়ে তোলার প্রক্রিয়া

ডুয়ার্স ও তরাইয়ের দু'লাখ শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস

আছে। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের পথ জটিল ও আঁকাবাঁকা, বিশেষ করে যেখানে বিভিন্ন দলমতের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ইউনিয়নের অবস্থান আছে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ডুয়ার্স অথবা দার্জিলিংয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার কোনও প্রচেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে হয়নি। বিভিন্ন ইউনিয়ন তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে তাদের অনুগত শ্রমিকদের দ্বারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে পিএসপি পরিচালিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিন দিনের ধর্মঘট পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাদের ন্যূনতম দাবিদাওয়ার কোনও মীমাংসা হয়নি। বিভিন্ন ইউনিয়নে তাই দাবিদাওয়া প্রস্তুত করা নিয়ে এত দিন পর্যন্ত কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। ইউনিয়নগুলির মধ্যে পরস্পর বৈরী ভাব ছিল বলে এক সঙ্গে বসাও সম্ভবপর ছিল না। বহু ক্ষেত্রে পিএসপি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ পশ্চিমবঙ্গ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও এআইটিইউসি কর্মীদের মধ্যে মারদাঙ্গায় পরিণত হচ্ছিল। ইউটিইউসি-র সঙ্গেও বিরোধ এবং কখনও কখনও শারীরিক আক্রমণ পর্যন্ত ঘটে যেত।

গড়ে উঠল শ্রমিক ঐক্য

ঐক্যবদ্ধ দাবি ও আন্দোলনের মুখে যে চা-বাগান মালিকরা পাতা তোলার মরশুমটি নির্বিবাদে কাটিয়ে দেবার জন্য বাধ্য হয়ে দু'আনা দৈনিক মজুরি বাড়াল, তারাই ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ যখন পাতির মরশুম একেবারে শেষ হয় গেল, তখন শ্রমিকদের উপর অস্বাভাবিক রকমের কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি পরোক্ষ ভাবে কমিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কাজের বোঝা এমন ভাবে বাড়ানো হল যে, বেশির ভাগ শ্রমিকের পক্ষেই তাদের দৈনিক পুরো মজুরি রোজগার করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কয়েকটি বাগানে এমনও হল যে, একদিনের কাজ পুরো করতে দু'দিন লেগে যেতে লাগল, অর্থাৎ শ্রমিকদের বাধ্য করা হতে থাকল দু'দিন কাজ করে এক দিনের মজুরি পেতে। এই কাজের বোঝা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আক্রমণ যেমন পুরনো স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের সাহায্যে বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ছাঁটাই ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান ভাবে চলতে থাকে। পুলিশ ও সরকার মালিকদের সাহায্যে এগিয়ে এল। বহু শ্রমিককে গ্রেফতার করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা প্রয়োগ করে তথাকথিত বিচারের প্রহসন শুরু হল।

কিন্তু সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও উৎসাহ দান সত্ত্বেও বাগান মালিকদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার দিকে এগিয়ে গেল।

বাগানে বাগানে বিভিন্ন ইউনিয়নের শ্রমিকগণ ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল। শ্রমিকদের মধ্যে এই ঐক্য এক নতুন সংগ্রামী চেতনা এনে দিয়েছিল। সাধারণত অতীতে পাতি ওঠার সময় শ্রমিকরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করত, আর পাতি ওঠা শেষ হয়ে গেলেই মালিকরা শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করত। এই ঘটনা দেখা গিয়েছে ১৯৫১-৫২ সালের শীতকালে অর্থাৎ '৫১ সালের ডিসেম্বর এবং আরও তীব্র ভাবে '৫২ ডিসেম্বর ও '৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে।

এ বার কিন্তু অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠার ফলে এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তারা এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে।

প্রতিরোধ ও প্রস্তুতি

ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, কাজের বোঝা বাড়ানোর বিরুদ্ধে এবং চার মাসের বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকে। বাগিচা মালিকরা আক্রমণ চালিয়েই যেতে থাকল।

সাধারণ ধর্মঘটের সময় মাত্র অল্প কয়েকটি বাগানেই চা-শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত ছিল। তরাইয়ের বাগিচা মালিকরা ডুয়ার্সের বাগিচা মালিকদের মতো একই রাস্তা নিয়েছিল। কাজের বোঝা বাড়ানো, ছাঁটাই, বাগান থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা প্রভৃতি মালিকরা একতরফা ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই এমনকী তরাইয়ের শ্রমিকরা, যারা ট্রেড ইউনিয়নে এই প্রথমবার (১৯৫৪ থেকে) সংগঠিত হল, তারাও দ্রুত বুঝতে পারল মালিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ও তাদের দাবি আদায় করতে হলে দরকার আরও ব্যাপক ঐক্য এবং ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক আন্দোলন। তাই অপেক্ষা করেছিল যতক্ষণ না ডুয়ার্সের শ্রমিকরা বোনাস-সহ অন্যান্য দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়।

ইউটিইউসি'র অন্তর্ভুক্ত ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও

এআইটিইউসি-র ইউনিয়ন প্রথমে ১৬ আগস্ট থেকে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। এইচএমএস পরিচালিত ওয়েস্ট বেঙ্গল চা শ্রমিক ইউনিয়ন ১৬ আগস্ট থেকে ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবৃতি দেয়। এআইটিইউসি এবং ইউটিইউসি পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একই তারিখে ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, কিন্তু এইচএমএস-এর নেতৃত্বে, এআইটিইউসি-র সঙ্গে যুক্ত ভাবে ধর্মঘট করতে রাজি ছিল না। তারা ধর্মঘটের আহ্বান জানানোর পরেও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহর করে নেয়। ইউটিইউসি'র পক্ষ থেকে ইউনিয়নের সভাপতি ননী ভট্টাচার্য জলপাইগুড়ি শহরে এসে এআইটিইউসি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইউটিইউসি-র পক্ষে ননী ভট্টাচার্য ছাড়াও গোপাল মৈত্র এবং সুরেশ তালুকদার প্রমুখ। অন্য দিকে এআইটিইউসি'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুবোধ সেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, মনোরঞ্জন রায়, গোবিন্দ কুণ্ডু প্রমুখ। এই সময় ডুয়ার্সের বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে সর্বজনপ্রিয় নেতা ছিলেন এ এইচ বেস্টারউইচ যিনি 'কালা সাহেব' নামে সর্বাধিক পরিচিত। এআইটিইউসি-র নেতৃবৃন্দ এইচএমএস-এর ধর্মঘটের তারিখ প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষিত ধর্মঘটের তারিখ পরিবর্তন করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু ইউটিইউসি নেতৃবৃন্দ ওই তারিখ পরিবর্তন করা অসম্ভব বলে ওই দিনই ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত জানান।

এইচএমএস-র নেতৃত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু হল যাতে তারা অবিলম্বে ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। অবশেষে এই দুই সংগঠন এআইটিইউসি ও এইচএমএস ২৯ আগস্ট থেকে ধর্মঘটে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তখন অসংগঠিত বাগানের শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে এগিয়ে আসে।

তরাইয়ের স্থানীয় কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়ন রাষ্ট্রীয় চা মজুর কংগ্রেস ও এআইটিইউসি-র নবগঠিত ইউনিয়ন তরাই চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

বাস্তবিক ১৯৫৫ সালের ২৯ আগস্ট থেকে সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার ফলে ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট আরও ব্যাপক হয়ে পড়ল। ঐক্যবদ্ধ ভাবে শুরু না হলেও, শেষ

পর্যন্ত ধর্মঘট ঐক্যবদ্ধরূপ ধারণ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২২ আগস্ট থেকে ডুয়ার্সের কুমারগ্রাম, রায়ডাক, জয়ন্তী, বীরপাড়া ও কালচিনি-সহ বহু এলাকার বাগানগুলিতে ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু হয়। ওই ধর্মঘট ইউটিইউসি-র একক উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। সে কারণে ধর্মঘট সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার জন্য সমগ্র ডুয়ার্সব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ধর্মঘটের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ধর্মঘট ভাঙার জন্য ইউটিইউসি কর্মীদের ওপরে কংগ্রেস সরকার প্রচণ্ড দমনপীড়ন শুরু করে। দলে দলে শ্রমিকদের গ্রেফতার করে জেলে আটক করা হয়। ধর্মঘটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন নারী শ্রমিকরা। এদের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে ধর্মঘট হয়তো সর্বাত্মক সফল হত না। এরা পুলিশের মুখোমুখি সংঘাত করেছেন, গ্রেফতার হয়েছেন, আন্দোলনের নেতাদের আশ্রয় দিয়েছেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর লাঠি ও গুলি চালানো হয়, ফলে বহু শ্রমিক আহত হন। এই ধর্মঘট পরিচালনার সময় ২৫ আগস্ট ইউটিইউসি-র তদানীন্তন রাজ্য সম্পাদক যতীন চক্রবর্তী হাসিমারায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁকে গ্রেফতার করে আলিপুর মহকুমা জেলে রাখা হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে ২২ আগস্ট রাত থেকেই গ্রেফতার করা শুরু হয়।

ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘট এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের মনোবলের প্রভাব সরকার ও মালিকদের উপরেও পড়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ আর্থিক বছরে চা-বাবদ বিদেশি মুদ্রা আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৪৭ কোটি টাকা। কাজেই ধর্মঘটের সময় ছিল তেজি বাজারের সময় এবং ধর্মঘটের প্রতিটি দিনই ছিল মালিকদের পক্ষে খুবই মূল্যবান। সুতরাং, মালিকরা ও সরকার উভয়েই দ্রুত মীমাংসায় আগ্রহী ছিল। ধর্মঘট চলাকালীন ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত প্ল্যানটেশন লেবার স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় সরকার ও মালিকপক্ষ নিম্নলিখিত দাবিগুলি মেনে নিতে রাজি হল—

১. প্ল্যানটেশন লেবার অ্যাক্টের অবিলম্বে প্রয়োগ

২. পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের প্রতি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অ্যাক্টের সুবিধার বিস্তৃতি

৩. রাজ্য সরকার অবিলম্বে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার সংশোধনের কাজ শুরু করবে

৪. বোনাসের প্রশ্নটি একটি বোনাস কমিটির কাছে পাঠানো হবে। তাতে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধি থাকবে ও একজন সরকারি উপদেষ্টা থাকবেন। এই কমিটিকে অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। যদি কমিটিতে কোনও ঐকমত্য না হয়, তবে সরকার বিষয়টি বিচারের জন্য আদালতে পাঠাবে কিনা ঠিক করবে।

এই ভাবে বিপুল শক্তিশালী মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে চা শ্রমিকরা জয়লাভ করল। ৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের তরাই শাখা ও কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত তরাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। ইউটিইউসি জানিয়ে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দকে মুক্তি না দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে। ১০ তারিখ ডুয়ার্স চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতারা মুক্তি পাওয়ার পর ইউটিইউসি ধর্মঘট প্রত্যাহার করে। ইউটিইউসি একটানা ১৮ দিন এই ধর্মঘট চালিয়ে যায়।

বোনাসের দাবিতে চা বাগিচার শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসের নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয় এই ধর্মঘটের মাধ্যমে। সারা ভারতের বাগিচা শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের ফলে আইনসঙ্গত ভাবে ১৫ দিনের বোনাস পেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি

১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করে। ১৯৬৩-৬৪ সালে বামপন্থী সংগঠনগুলির পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তখন পৃথক ভাবে কোনও গণসংগঠনের পক্ষে কর্মসূচি গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি ও ইউটিইউসি-সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের ও বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি'। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা যতীন চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন রায় ছিলেন 'রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি'র আহ্বায়ক। এরই পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সংগঠন, এবিটিএ, বিমা কর্মচারী ইউনিয়ন-সহ সরকার পরিচালিত শিল্প-শ্রমিকদের নিয়ে যুক্ত আন্দোলনের লক্ষে গড়ে উঠেছিল '১২ জুলাই কমিটি'। ১৯৬৫ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে বহু সংগ্রাম, আন্দোলন ও ধর্মঘটে শ্রমজীবী মানুষ ব্যাপক ভাবে শামিল হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতি কলকারখানায় ছাঁটাই, লক-আউট ও বেকারি বৃদ্ধি, কৃষকের ফসল রক্ষা সহ বার বার গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ, রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তৎকালীন রাজ্যপাল ধমরভীর-এর রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে দেয়। সেই রাত্রেই রাজনৈতিক দল সমূহের ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ২২-২৩ নভেম্বর দু'দিন সর্বাত্মক বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভাঙার প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৪টি সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এই সময় রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক যতীন চক্রবর্তীকে 'হরতালদা' নামে অভিহিত করা হত। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজকর্ম ও সংগঠন গড়ে তোলা, সভা, সমাবেশ ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যায়।

৬০-এর দশকের শুরু থেকে পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের ইতিহাসে দু'জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। একজন জ্যোতি বসু, অপরজন যতীন চক্রবর্তী। রাজনৈতিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও জীবন-জীবিকার সংগ্রামে সংগঠন গড়া থেকে বিরত করতে পারেনি। '৪০-এর দশক থেকেই বাংলার দেশি-বিদেশি মালিকদের, সওদাগরি অফিসের মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা সংঘটিত হতে থাকেন। ১৯৪৬ সালে এদের নিয়েই গড়ে ওঠে 'মার্কেন্টাইল ফেডারেশন'।

উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ধর্মঘট

স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বেশ কয়েকবার বিভাজনের সম্মুখীন হয়। স্বভাবতই এই বিভাজনগুলির কারণ যাই হোক না কেন, শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠিত শক্তিকে যথেষ্ট দুর্বল করে দেয়।

ইতিমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক সংকটও গভীরতর হতে শুরু করে এবং অন্যান্য পুঁজিবাদী সরকারের অনুরূপ ভারত সরকারও সংকটের বোঝা শ্রমিকশ্রেণির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তা ছাড়া এই সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও সামরিক সংঘর্ষ ঘটে এবং ভারতের সক্রিয় ভূমিকায় একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও এই সব ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং শ্রমিকশ্রেণির অবস্থার উপর এর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়।

অর্থনৈতিক সংকট এবং একাধিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের তীব্র প্রতিফলন ঘটে শাসক দলের উপরও। তাই শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে বেতন সংকোচন এবং ভারতরক্ষা আইন, এসমা, সংবিধানের ৩১১(২) বিওসি ধারা ইত্যাদি প্রয়োগদ্বারা দমনমূলক ব্যবহারটাই শুধু নয়, সমগ্র দেশের উপর জরুরি অবস্থা জারি করে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারকেও স্থগিত করে দেওয়া হয়।

এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ জঙ্গিরূপ ধারণ করলে রাজ্যের সরকার এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য তীব্র দমনপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকার পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী প্রয়োগ, পি ডি অ্যাক্ট ও মিসা প্রয়োগ করে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার এমনকী কর্মীদের বরখাস্ত করে সরকার শ্রমিকশ্রেণিকে দমন ও সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা করে।

উদাহরণস্বরূপ ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের যে ধর্মঘট সংগঠিত হয় তা দমন করার জন্য সমগ্র ইস্পাত নগরীটিকেই সশস্ত্র পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর এক ছাউনিতে পরিবর্তন করা হয়। হিন্দ মোটরস-এও শ্রমিকদের উপর তীব্র পীড়ন চালানো হয়। ১৪৪ ধারা জারি করা ও গ্রেফতার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়। এ ছাড়াও প্রায় ৪০০ রুগ্‌ণ শিল্প এই সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার দর্শকের ভূমিকাই পালন করে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ ভাবে ২৭ অগস্ট ’৭১ রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের আমলাতান্ত্রিক সরকার এই ধর্মঘট ব্যর্থ করবার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সফল হয়নি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই ধর্মঘটের দাবিগুলির মধ্যে নবজাত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটিও অন্যতম দাবি হিসাবে ছিল। শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই দাবিটির সংযোজন উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বভাবতই দাবিগুলি যথেষ্ট জনসমর্থন অর্জন করেছিল।

দ্য ইকনমিক্স টাইমস লিখেছিল, কলকাতার প্রধান কর্মকেন্দ্র ডালহৌসি স্কোয়ার জনমানবহীন ছিল। সারাদিন ধরে ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল। সরকারি অফিসগুলি খোলা থাকলেও উপস্থিতির হার ছিল সামান্যই। সমস্ত কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস এবং রেল স্টেশন অচল ছিল।

সরকারের হুমকি ও পুলিশি ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে হরতাল সফল হয়েছিল তা সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকেই প্রতিপন্ন হয়। এই ধর্মঘট ও হরতালের অনতিকাল পরেই পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ১৩ জনকে সংবিধানের

৩১১(২) গ ধারায় কোনওরূপ কারণ না দর্শিয়ে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে আকস্মিক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। এই বরখাস্তের আদেশ শুধু রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেই নয়, রাজ্যের সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার করে। এই বরখাস্তকরণের বিরুদ্ধেই ১৩ অক্টোবর ১৯৭১ রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সময়ে শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব দাবিতে বিভিন্ন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় যে আধা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একটা অংশ কোনও কোনও শিল্পকেন্দ্রে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল।

কিন্তু এই সন্ত্রাসের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের দাবিতে লড়াই করা থেকে বিরত করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতেও চটকল শ্রমিকরা তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন (সিআইটিইউ), বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল চটকল মজদুর ইউনিয়ন (ইউটিইউসি) এবং বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (ইউটিইউসি-এল এস), ৯ এপ্রিল ১৯৭২ প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে ৮ মে ১৯৭২ থেকে চটকল শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের আহ্বান দেয়। পরে টিইউসিসি-র পক্ষ থেকে ওই একই দিন থেকে ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়।

ধর্মঘটের আহ্বান যৌথ ভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের উপরতলার বেশ অনৈক্যও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তদসত্ত্বেও একই দিনে ধর্মঘট ঘোষণার মধ্য দিয়ে নিচুতলার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হয়েছিল।

সকলের জন্য বোনাস

এই সময়ের সংগ্রামগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রমিক কর্মচারীদের দৃষ্টি এই সময় বোনাসের দাবির প্রতিই অধিকতর নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বোনাসের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েই কেন্দ্রীয় সরকার বোনাস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৮ সালে বোনাস অ্যাক্ট পাশ করে। আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি এবং হিন্দ মজদুর সভার প্রতিনিধিরাও বোনাস কমিশনের সদস্য ছিলেন।

১৯৬৮ সালের বোনাস অ্যাক্টে কোম্পানির ব্যালান্স সিটের অর্থাৎ লাভের ভিত্তিতে ৪ শতাংশ ন্যূনতম বোনাস ধার্য হয়েছিল। এআইটিইউসি-র প্রতিনিধি এস এ ডাঙ্গে সমেত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা বোনাসের এই ফর্মুলার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

বোনাস অ্যাক্ট শ্রমিকশ্রেণিকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। তার কারণ ছিল প্রধানত দুটি। প্রথমত বোনাস সংশ্লিষ্ট কোম্পানির মুনাফার উপরই নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয়ত বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল অতি সামান্য ৪ শতাংশ। তাই কোম্পানির মুনাফা থেকে বোনাসকে পৃথক করা এবং ন্যূনতম বোনাস ৮.৩৩ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি করার জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম ফেটে পড়ল।

ইতোমধ্যে উচ্চতর আদালতের রায়ের বোনাসকে চালু নিম্নতর বেতন এবং জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় বেতনের মধ্যে তারতম্য দূর করা অর্থাৎ বিলম্বিত বেতন হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

রেল শ্রমিকদের জঙ্গি সংগ্রাম

স্বাধীন ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন দেশের রেল শ্রমিকগণ। ১৯৬৮ সালের ধর্মঘটের পরিণতিতে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের সরকারি স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ফেডারেশন স্বীকৃতি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নেই বিশেষ ব্যাস্ত ছিল। স্বীকৃতি প্রশ্নে এই ব্যর্থতার ফলে রেল কর্মচারীদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবিগুলি অবহেলিত হয়ে যায়।

অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের নেতৃত্বেও কিছু পরিবর্তন হল। লোকো স্টাফদের সংগ্রামের অনতিকাল পরেই অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েজ মেন্স ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এবং জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ফার্নাণ্ডেজ সোস্যালিস্ট পার্টির এবং ইউনাইটেড কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নেরও সভাপতি ছিলেন। জর্জ ফার্নাণ্ডেজ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে রেল শ্রমিকদের মূল দাবিগুলি অর্জনের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান দিলেন।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এমপ্লয়িজ কনফেডারেশনও ১৪/১৫ এপ্রিল ৭৪ থেকে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, বোনাস ৪ পয়েণ্ট মূল্যবৃদ্ধির জন্য ছয় মাসের ভিত্তিতে শতকরা

শতভাগ ক্ষতিপূরণের দাবিতে 'নিয়মমাফিক কাজের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশনও তাদের বেতন স্কেলের পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠনের দাবিতে ১৮ মার্চ ১৯৭৪ এক দিনের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন সংগ্রামের এই সিদ্ধান্তগুলির ফলে এআইআরএফ আহুত কনভেনশন সফল হতে এবং এনসিসিআরএস গঠিত হতে আর কোনও বাধা থাকে না।

১৫ মার্চ ১৯৭৪ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আর একটি যৌথ কনভেনশন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের এই মনোভাবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই ভাবে রেল ও কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের দেশব্যাপী মৌলিক দাবি সমূহের ভিত্তিতে এক যৌথ জঙ্গি গণসংগ্রাম গড়ে তোলার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি হল। এই সংগ্রামের দাবিগুলির মধ্যে ছিল প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, মূল্যসূচি বৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ, সকলের জন্য বোনাস, ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের নিয়মিতকরণ, পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং সমস্ত রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও দমননীতি প্রত্যাহার।

এনসিসিআরএস এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলি ২৩ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখের ৮ মে থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট শুরু করার নোটিশ জারি করে।

সরকার শ্রমিক কর্মচারীদের উপর দমনপীড়ন নিয়ে নেমে এল। এসেন্সিয়াল সার্ভিসেস মেইনটেনান্স জারি করে ধর্মঘটকে বেআইনি ঘোষণা করা হল এবং ওই অর্ডিনান্স ও মেইনটেনান্স অর্ডিনান্স অব ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট প্রয়োগ করে ৫০,০০০-এর অধিক রেল ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক কর্মচারীকে গ্রেফতার করা হল। বহু রেল শ্রমিকের সরাসরি বিচার হয় এবং এক বৎসরের কঠোর কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। ৩০০০ শ্রমিক কর্মচারীকে রুল ১৪(২) ধারায় আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়। রেল কলোনিগুলিতে পুলিশি সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। শ্রমিকদের বাড়িঘরে হামলা করা হয়। শ্রমিকরা যাতে চলাফেরা বা কোনও জমায়েতে অংশগ্রহণ না করতে পারে তার জন্য রেল কলোনিগুলিতে কার্ফু জারি করা হয়। নারীদের নিগ্রহ করা হয় এবং পুরুষদের উপর প্রতিহিংসামূলক দৈহিক অত্যাচার করা হয়। ৫০০০ কেন্দ্রীয় কর্মচারীকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

ইতোমধ্যে অল ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন সরকারের সঙ্গে ছোটখাটো দাবিদাওয়ার মীমাংসা করে সম্মিলিত ধর্মঘট থেকে সরে এল।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐক্যবিরোধী কাজকর্ম সত্ত্বেও রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট ঘোষিত নির্দিষ্ট দিনের এক দিন পর ৯ মে ১৯৭৪ থেকে শুরু হয়েছিল। কোনও কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় ধর্মঘটীদের সংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু দিল্লি সমেত অনেক স্থানেই ধর্মঘট অত্যন্ত দুর্বল ছিল। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে কর্মচারীরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেননি।

রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটে নানা দুর্বলতা দেখা যায়। ব্যাপক দমনপীড়ন ও সন্ত্রাস ইতিমধ্যেই রেল শ্রমিকদের মনোবলের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ১৫ মে ১৯৭৪ দেশব্যাপী সংহতিমূলক ধর্মঘটের আহ্বান দেয়। অভূতপূর্ব দমনপীড়নের সামনে এই সংহতিমূলক ধর্মঘট রেল শ্রমিকদের মনোবলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ধর্মঘট পশ্চিম রেলওয়ে এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ভেঙে যেতে শুরু করে তখন জেলে বন্দি জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ২৯ মে ১৯৭৪ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার ঘোষণা করলেন।

সরকারের দমনপীড়ন এত ভয়াবহ ও ব্যাপক ছিল যে ধর্মঘট যখন শেষ হল তখন দেখা গেল যে প্রায় ৩০,০০০ ক্যাজুয়াল ও অস্থায়ী কর্মচারী সহ প্রায় ৫০,০০০ শ্রমিক কর্মচারী বরখাস্ত হয়ে গিয়েছেন। গ্রেফতার হওয়া আরও ৩০,০০০ শ্রমিককে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর উপর চাকুরিচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট: পুনর্মূল্যায়ন

জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যবহ ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই সময় এত ভয়াবহ ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল, ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে যার কোনও তুলনা ছিল না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) প্রথম দিকে জয়প্রকাশের আন্দোলন সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে দলের কৌশলগত দুর্বলতার ফলে জয়প্রকাশের আন্দোলনের পশ্চাতে যে বিশাল

জনগণ সমবেত হয়েছিল তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে সক্ষম হল না। সিপিআই (এম) বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যের লাইনেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিল যদিও এই কৌশলগত লাইন এক বিরাট ধাক্কার সম্মুখীন হল। স্পষ্টতই এই রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের প্রশ্নটি গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। (সূত্র: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, সুকোমল সেন)

এই সময়ে প্রশ্নটা ছিল কী উপায়ে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কংগ্রেসের কর্তৃত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা যায়। বিশেষ করে জরুরি অবস্থা জারির পর সমস্ত রকম মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া, নাগরিক অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া, নাগরিক অধিকার ও পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে দলন করার পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করা যায়।

যাই হোক, জরুরি অবস্থার সময় গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যে দাবিগুলি প্রাধান্যলাভ করে সেগুলি ছিল: (ক) জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার (খ) মিসা, ডিআইআর ও অন্যান্য বিপজ্জনক আইনগুলি বাতিল করা (গ) মিসা এবং ডিআইআর-এ বন্দি রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মুক্তি (ঘ) রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন পত্র-পত্রিকা সহ সংবাদপত্রের উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার (ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সংগঠনের স্বাভাবিক কাজকর্মের প্রত্যার্পণ এবং (চ) পার্লামেণ্টারি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরায় চালু এবং সদস্যদের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার।

জরুরি অবস্থার শৃঙ্খল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুক্তি ও অগ্রগতির জন্য এই দাবিগুলি আদায় করা জরুরি হয়ে পড়েছিল।

জরুরি অবস্থার অবসান ঘটে ১৯৭৭ সালে। আন্তর্জাতিক চাপের ফলে ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জনসাধারণের মনে যে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ জমে উঠেছিল, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্বাচনে। কংগ্রেস দল পরাস্ত হয়, স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হন।

জরুরি অবস্থায় হৃত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ধীরে ধীরে জনসাধারণ ফিরে পেতে থাকেন। কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

১৯৮০ সালে শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ডিভিসি স্টাফ

অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি বাতিলের প্রতিবাদে এক দশকের সংগ্রাম।

১৯৭৭ সালে জনসাধারণের বিপুল জনসমর্থন থাকলেও অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে জনতা পার্টি ভেঙে যায় ও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পুনরায় ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করে।

এইস ময় ১৯৮০ সালের ৩ অক্টোবর ডিভিসি-র শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামী সংগঠন ডিভিসি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিভিসি চেয়ারম্যানের উপরে শারীরিক হামলার এক কল্পিত কাহিনি প্রচার করে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ এক দিকে স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি যেমন বাতিল করে অন্য দিকে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। পুনরায় কংগ্রেস সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়।

এই অবস্থায় দীর্ঘ এক দশক ডিভিসি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন সংগ্রাম করেই ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিতে।

বিশ্বায়নবিরোধী ধর্মঘট ও আন্দোলন
(১৯৯১—৯৫)

ক্রমবর্ধমান সঙ্কট

পুঁজিবাদের বেঁচে থাকার আবশ্যিক শর্ত হল— পুঁজির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি করা, বিনিয়োগ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, নতুন নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্রের উদ্ভাবন এবং পুঁজির জোগান অব্যাহত রাখা। এই বিনিয়োগ ও জোগান প্রক্রিয়া সম্ভব হবে পুঁজির একীকরণের মাধ্যমে। পুঁজির একচেটিয়াকরণের মাধ্যমেই পুঁজির একীকরণ তথা কেন্দ্রীকরণ ও ঘনীভবন সম্ভব।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিত্যসঙ্গী হল সঙ্কট। প্রতি মুহূর্তে বিনিয়োগ অর্থাৎ অর্থের জোগান নিশ্চিত রাখতে না পারলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির রথ থমকে যাবে। মুনাফার হার কমে আসাই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি ধরে রাখার প্রয়োজনেই বাণিজ্যের নতুন নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান করা। প্রয়োজন নতুন নতুন বাজার। এক কথায় বাণিজ্যের বিশ্বায়ন। শ্রমের বিশ্বায়নকে প্রতিহত করার জন্য চাই পুঁজির বিশ্বায়ন। সংক্ষেপে এটাই পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

পুঁজির বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বা পুঁজির সঙ্কটের অনিবার্যতা। বিশ্বায়ন প্রতিদিন দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিস্তার ঘটিয়ে

চলেছে। বেড়ে চলেছে ক্ষুধা ও কর্মহীনতা ও মানুষে মানুষে আয়ের বৈষম্য। গড়ে উঠেছে বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনের ও প্রতিরোধের বিশ্বায়িত সংগ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গেও সংঘটিত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়েছেন শুধু তাই নয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষও ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন প্রতিটি সংগ্রামে, ধর্মঘটে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৯৮৯-এর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নবম লোকসভা নির্বাচনে ভি পি সিংয়ের নেতৃত্বে যে অকংগ্রেসি সরকার গঠিত হয় সেই সরকার শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের স্বার্থে কতকগুলি সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতি সমূহের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। যদিও এই সরকার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেনি।

যাই হোক, ১৯৯০ সালের অক্টোবর চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে লোকসভার কিছু সদস্য দল ছেড়ে যাওয়ায় ওই সরকারের পতন ঘটে এবং কংগ্রেসের সমর্থনে চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে এক সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করায় সেই সরকারের পতন ঘটে।

বিশ্বায়নের পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া

১৯৯১-এর জুন মাসে অনুষ্ঠিত লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসাবে জয়ী হয়ে নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরই বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দেশ মতো নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনে বিশ্বায়নের এই পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ এক ভয়াবহ দুর্দশার সৃষ্টি করে এবং এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনও সংগঠিত হয়। শুধু ভারতবর্ষেই শ্রমজীবী মানুষ আক্রমণের মুখে পড়েছেন তা নয়, বিশ্বের কর্মজীবী মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ঋণগ্রহীতা দেশের উপর যে ধরনের শর্ত চাপিয়ে দেয়, তাতে ওই ঋণগ্রহীতা দেশের পক্ষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যে শর্তগুলি চন্দ্রশেখর সরকারের উপর চাপানো হয়েছিল, তা হল—

(ক) রাষ্ট্রায়ত্ত (পাবলিক সেক্টর) ক্ষেত্রের শিল্পনীতি পরিবর্তন করে তা ব্যক্তি মালিকানার শিল্পের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে।

(খ) যে সমস্ত কলকারখানা প্রতিযোগিতার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, সেগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে। শিল্প হবে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতাভিত্তিক।

(গ) বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির কাছে দেশের দরজা খুলে দিতে হবে এবং ঋণগ্রহীতা দেশে ওই কর্পোরেশনগুলির কার্যকলাপের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

(ঘ) লাইসেন্স প্রথা এবং আমদানি নীতির উদারীকরণ করতে হবে।

(ঙ) স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হবে যাতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে শিল্পোন্নত দেশগুলি সুবিধাভোগ করে।

(চ) খাদ্য এবং সারের উপর সমস্ত ভর্তুকি তুলে দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙে দিতে হবে।

(ছ) যাত্রী পরিবহণ শিল্পে (অর্থাৎ শিল্পায়নের ও বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা) রেল, বাস, বিমানে ভাড়া বৃদ্ধি করতে হবে এবং (জ) শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন সংকোচন করতে হবে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই শর্তগুলির প্রতিটিই দেশের জনগণের জীবন ও জীবিকার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে সর্বনাশ। প্রবল বেকারি বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের দুর্দশা, দারিদ্র ও অনাহার হয়ে উঠল জনজীবনের নিত্যসঙ্গী।

স্বভাবতই, ভারত সরকারের এই অর্থনীতি শ্রমিক-কর্মচারী সাধারণ মানুষের জীবনে চরম বঞ্চনা ও দুর্দশা নামিয়ে আনে এবং ফলস্বরূপ এই নীতির প্রতিরোধ ভারতের শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

প্রতিবাদ প্রতিরোধ শুরু

১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকেই নরসিংহ রাও সরকার বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নির্দেশ মতো যে জনবিরোধী অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। সর্বভারতীয় স্তরে গণসংগঠন সমূহ কর্তৃক গঠিত ন্যাশনাল ক্যাম্পেন কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ ভাবে এই নীতির প্রতিবাদ করে। ন্যাশনাল ক্যাম্পেন কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শিল্পনীতিতে যে পরিবর্তনগুলি

ঘোষিত হচ্ছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দাবি করা হয়:

১. ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত শিল্পে বিনিয়োগের জন্য লাইসেন্সপ্রথা বাতিল ও দেশি শিল্পে ৫১ শতাংশ ইক্যুইটির মঞ্জুরির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

২. দাবি করা হয় যে, বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ বর্তমান সীমারেখা অতিক্রম করবে না এবং কোনও ক্ষেত্রেই তা শতকরা ৫১ ভাগ হবে না।

৩. আধুনিক প্রযুক্তির আমদানি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন, বেকারি, দেশি শিল্পের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করা উচিত।

৪. তথাকথিত এক্সিট পলিসি এবং ইচ্ছেমতো কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা শ্রমিক স্বার্থকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ করবে। দুঃখের বিষয়, ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পদ্ধতি ক্রমশ উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং এই সব বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি।

৫. অষ্টম পরিকল্পনায় বেকারি সমস্যা সমাধানে যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেই নিরিখে প্রস্তাবিত নীতিগুলি যাতে বেকারি দূরীকরণকে সুনিশ্চিত করতে পারে তা দেখতে হবে।

৬. প্রস্তাবিত ব্যাপক বেসরকারিকরণ কার্যত এমনকী ব্যাঙ্ক শিল্প ও লাভজনক সরকারি শিল্পেও হবে স্বনির্ভর স্বাধীন অর্থনীতির বিরোধী।

৭. ক্ষুদ্র শিল্পকেও উৎসাহ দান প্রয়োজন। অথচ বিপরীতে সরকার এই শিল্পগুলিকে নিম্নতম সুদের হারে ঋণ দেওয়া বন্ধ করছে এর ফলে এই শিল্পগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকারি বৃদ্ধি পাবে।

৮. অনিয়ন্ত্রিত ভাবে একচেটিয়া পুঁজি এবং বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধিকে সীমিত করতে হবে।

৯. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ জর্জরিত হচ্ছে। ভর্তুকি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত এই মূল্যবৃদ্ধি আরও তীব্র করবে এবং ফলে দরিদ্রতর মানুষদের দুর্দশা আরও বাড়বে। তাই খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে ও গণবণ্টন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক সংকট নিরাময়ের জন্য ধনীর উপর চাপ বেশি পড়ে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, শ্রমিকশ্রেণি অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য সরকারের যে কোনও অনুকূল পদক্ষেপের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। শ্রমিকশ্রেণিকে

দেশের আর্থিক স্বনির্ভরতাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি

নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন ও তার শ্রমিক বিরোধী পরিণামের বিরুদ্ধে অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীরাও আন্দোলনের পথে অগ্রসর হন। ১৯৯১ সালের ১৩ অগস্ট অল ইণ্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের আহ্বানে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী সরকারের আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনসমূহ ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

নয়া আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট

ভারতের শ্রমিক-কর্মচারীরা ২৯ নভেম্বর এক অভূতপূর্ব ধর্মঘট সংগঠিত করলেন। ধর্মঘটের ফলে সারা ভারতে পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকারি কর্মচারী সব ক্ষেত্রেই কাজকর্ম ওই দিনের জন্য স্তব্ধ হয়েগেল। ব্যাঙ্ক বিমা, সাধারণ বিমা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত, খনি, বস্ত্র, ঔষধ, ইলেকট্রনিক্স, সড়ক পরিবহণ, হোটেল, দোকান ইত্যাদি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখলেন।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই ধর্মঘটে অল ইণ্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন সহ ৪০টি জাতীয় ফেডারেশন যোগদান করেছিল। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা অধিকাংশ রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারীরাও অনেক রাজ্য ধর্মঘটে যোগ দেন।

এই ধর্মঘটে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বহু উচ্চস্তরীয় কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগদান করেছিলেন।

বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র যারা শ্রমিকদের পক্ষ অবলম্বন করে না তারাও এই ধর্মঘটের সাফল্য স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়েই বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার নির্দেশিত নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ধর্মঘটের সূত্রপাত ঘটল।

নতুন শিল্পনীতির দ্বারা ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই পরিকল্পনা করে এবং ৫৮টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থা বন্ধ করে বহু শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতির যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে এবং সামগ্রিক ভাবে নতুন শিল্পনীতির বিরুদ্ধে সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ১০ মার্চ ১৯৯২ লক্ষ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক মিছিল সমাবেশের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করে।

৩০ এপ্রিল ১৯৯২ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীরা ওই শিল্পের ইউনিয়ন সমূহের আবেদনে একদিন সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন। ওই ধর্মঘট পালিত হয় ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির যুক্ত সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে। দাবি একটাই ছিল, তা হল পেনশনকে অবসরগ্রহণকালীন তৃতীয় সুবিধা হিসাবে প্রদান। বঙ্গে কোনও ব্যাঙ্কের দরজা খোলা ছিল না।

১৬ জুন, ১৯৯২

সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা যে সংগ্রাম গড়ে তোলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ও সর্বভারতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আহ্বানে দিল্লিতে মবলঙ্কর হলে এক জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, হিন্দু মজদুর সভা, ইউটিইউসি, ইউটিইউসি (লেনিন সরণি), এআইসিসিটিইউ এবং ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি, অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন, কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের কনফেডারেশন ইত্যাদির থেকে দেড় হাজার প্রতিনিধি এই জাতীয় কনভেনশনে যোগদান করেন।

এই কনভেনশনের পক্ষ থেকে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারের শ্রমিকবিরোধী নয়া আর্থিক নীতি পরিবর্তনের দাবি এবং বিরাষ্ট্রীকরণ, ছাঁটাই, ক্লোজার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ১৬ জুন, ১৯৯২ এক দিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়।

স্মরণে রাখা দরকার যে ২৯ নভেম্বর ১৯৯১ তারিখে সাধারণ ধর্মঘটের প্রায় ৬ মাসের মধ্যে দেশব্যাপী এই দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ভারতের শ্রমিক কর্মচারীরা এক

উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ওই দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত শিল্প, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, কয়লাশিল্প, বেসরকারি ক্ষেত্রের অধিকাংশ শিল্প, চা-শিল্প, সরকারি কর্মচারীরা সকলেই ব্যাপক ভাবে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীরাও যেমন অসামরিক বিমান পরিবহণ, দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীরা, পোস্টাল, টেলিকমিউনিকেশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা, রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকরাও ব্যাপক ভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ জুন ধর্মঘট বিগত ২৯ নভেম্বর, '৯১ ধর্মঘটকে অতিক্রম করে বৃহত্তর আকার ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসে এ যাবৎ কালের অন্ধকারতম দিনটি এসে গেল। ৬ ডিসেম্বর, '৯২ তথাকথিত করসেবকরা হাজারে হাজারে অযোধ্যায় সমবেত হয়ে বাবরি মসজিদের উপর হামলা চালিয়ে মসজিদটিকে ভেঙে ফেলে। সেই সময় উত্তরপ্রদেশ ছিল বিজেপি শাসনাধীন রাজ্য। পুলিশের চোখের সামনেই আধুনিক কালের এই প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী হিংসার তাণ্ডব ঘটে গেল, যা দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাতের চক্রান্ত।

৬ ডিসেম্বরের বর্বরোচিত এবং মধ্যযুগীয় ঘটনায় তৎক্ষণাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেও অবিলম্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৮ ডিসেম্বর '৯২ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারত বন্‌ধের আহ্বান দেওয়া হয়। সর্বক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে 'ভারত বন্‌ধ' সফল করে বৃহত্তর জনগণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেই রায় দিল।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৬ ডিসেম্বরের পরের দিন ৭ ডিসেম্বর 'বাংলা বন্‌ধ' পালিত হল সর্বাত্মক ভাবে। সমস্ত ধর্ম ও জাতির মানুষ এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও জনসংগঠন এতে শামিল হল। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও শিল্পীররাও গণমিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা যে ভারতীয় গণতন্ত্র ও সংবিধানের মেরুদণ্ড তা পুনরায় প্রমাণিত হল সার্বিক ভাবে সর্বস্তরের মানুষের ধর্মঘট সফল করার মাধ্যমে।

ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থা

ব্যাঙ্ক ও বিমা শিল্পের কয়েক লক্ষ কর্মচারী ১৯ মার্চ, ১৯৯৩ দেশব্যাপী

সফল ধর্মঘটে শামিল হন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবন বিমা, সাধারণ বিমা, নাবার্ড ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট পালিত হয়। দাবি ছিল কনট্রিবিউটারি পেনশন প্রকল্প চালু করা এবং তা অতিরিক্ত অবসরকালীন সুবিধা হিসেবেই প্রদান করতে হবে। এর জন্য কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পদ্ধতি যেমন ছিল, তেমনই চলবে। প্রত্যেক কর্মীকে বোনাস প্রদান, ব্যাঙ্কগুলিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ চলবে না, দেশি বা বিদেশি নতুন কোনও ব্যাঙ্ক স্থাপন করা চলবে না।

১৮ মার্চ অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানেও প্রায় অনুরূপ দাবিতে ব্যাঙ্ক শিল্পে ধর্মঘট পালিত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

১৫ এপ্রিল দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে ৭০০০ ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিশাল কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে ভারত বন্‌ধ ও সাধারণ ধর্মঘট অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। সারা ভারতের ১০ হাজারের বেশি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এই বন্‌ধ ও হরতাল ব্যর্থ করতে।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, ত্রিপুরা, বিহার, মণিপুর, অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে এই বন্‌ধ সর্বাত্মক হয়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে কাজকর্ম বন্ধ থাকে। লক্ষ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পে সফল ধর্মঘট পালিত হয়। বিশেষত ভারী শিল্প, সার কারখানাগুলিতে, কয়লাখনি সমূহে, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, প্রতিরক্ষা শিল্পে এবং পোর্ট ও ডকেও কাজকর্ম অচল হয়।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে ব্যাঙ্ক ও জীবন বিমা শিল্পের কর্মচারীরা এক দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

ইস্পাত শিল্পে ধর্মঘট

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ৭ সেপ্টেম্বর '৯৩ ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকরা এক দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হন। ইস্পাত শিল্পের সমস্ত ইউনিয়নের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন।

আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, সিআইটিইউ, এইচএমএস ও বিএমএস, ইউটিইউসি সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন একই সঙ্গে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। এই ধর্মঘট রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ বিরোধী আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়।

ডাক ধর্মঘট

১৯৯৩ সালের শেষে ৬ লক্ষ ডাক কর্মীর দেশব্যাপী ধর্মঘট অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হয়। এনএফপিই, এফএনপিও এবং অন্যান্য ডাক কর্মীদের বিভিন্ন ইউনিয়নের আহ্বানে ৭ থেকে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ এই ধর্মঘট পালিত হয়।

এই ধর্মঘটের ফলে সারা দেশে ডাক পরিষেবা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পার্লামেন্টেও এই ধর্মঘটের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করেই ধর্মঘট সফল হয়। ১১ ডিসেম্বর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স শিল্পে

ইতোমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক-কর্মচারীগণ, বিশেষ করে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এআইবিএ, বেফি ও এআইবিওএ-র আহ্বানে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ব্যাঙ্ক কর্মীদের ধর্মঘট। দাবি ছিল— (১) বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে (২) বিভিন্ন শাখা বন্ধ করা চলবে না এবং (৩) অবিলম্বে বেতন সংশোধন, পেনশন স্কিম চালু করা ইত্যাদি।

ব্যাঙ্ক শিল্পে ধর্মঘটের অনতিকাল পরেই ৮ এপ্রিল ও ১১ মে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ওই একই দাবিতে পুনরায় এক দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হন। ১৭ ফেব্রুয়ারি ও ৮ এপ্রিল ধর্মঘটের দাবিগুলি স্বীকার না করে সরকার সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ৪৯ শতাংশ শেয়ার বিক্রয় করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। তাই কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে পুনরায় ধর্মঘটে শামিল হন।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক কর্মচারী

ভারত সরকারের বেসরকারিকরণের নীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে

এমনকী ওএনজিসি, ইণ্ডিয়ান অয়েল, মারুতি, ভেল প্রভৃতি লাভজনক এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিকরা যৌথ ভাবে ১৪ জুলাই, '৯৪ এক দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

এই সময় যদিও বিভিন্ন শিল্পে, ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স ও সরকারি দফতরে সরকারের মারাত্মক অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ও আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে, তেমনই সরকার ও মালিকপক্ষ তাঁদের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নীতিও কার্যকর করার ক্ষেত্রে অনড়ই থেকেছে। বরং শ্রমিক-কর্মচারী ও জনগণের অন্যান্য অংশের উপর আক্রমণকে তীব্রতরই করেছে।

গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চ (ন্যাশনাল প্লাটফর্ম অব মাস অর্গানাইজেশন)-এর পক্ষ থেকে ২১ জুন '৯৪ দিল্লিতে তালকোটরা স্টেডিয়ামে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় ৬০০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত গণ কনভেনশনে সরকারের সর্বনাশা অর্থনৈতিক নীতি এবং গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে সংগ্রাম চলেছিল তাকে আরও ব্যাপক ও তীব্র করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সরকারের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক নীতিকে পরাস্ত করার জন্য এবং ১৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ২৯ সেপ্টেম্বর, '৯৪ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়। পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক-কৃষক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ধর্মঘটে ব্যাপক ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চের আহ্বানে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ যে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হল, তার সাফল্য ও বিস্তৃতি অতীতের সমস্ত রেকর্ডকেই অতিক্রম করে যায়।

ধর্মঘটে প্রায় আড়াই কোটি শ্রমিক কর্মচারী মেহনতি মানুষ অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, কেরল ও তামিলনাড়ুতেও এই বন্‌ধ পালিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, ওড়িশা, মণিপুর, কেরল, হরিয়ানা এবং কর্ণাটকে এই সাধারণ ধর্মঘট বন্‌ধে পরিণত হয়। তামিলনাড়ুতে ধর্মঘটের আহ্বায়ক

ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছাড়াও ডিএমকে ও এডিএমকে পরিচালিত ইউনিয়নগুলিও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালে গ্যাট প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির উদ্দেশে সক্রিয় রূপ ধারণ করে। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্যাটের নতুন রাউণ্ড— উরুগুয়ে রাউণ্ড আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ডাঙ্কেল ড্রাফটের ভিত্তিতে মরক্কোর মারাকাসে ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ এই বিষয়ে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। এই ভাবে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সঙ্গে তৃতীয় একটি সংস্থা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লুটিও) গঠন করে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের উপর তাদের বাণিজ্যিক দাপট ও স্বার্থকে সুরক্ষিত করে। জনমত উপেক্ষা করেই ভারত সরকার কার্যত আত্মসমর্পণ মেনে নেয় এবং ১৯৭০ সালে গৃহীত পেটেন্ট অ্যাক্ট পরিবর্তন করে দেশের ভেষজ শিল্প ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষতি করে।

শিল্পে শিল্পে রাজ্যে রাজ্যে

গণ সংগ্রামের ইতিহাসে এই বছরটি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের বৃহৎ বৃহৎ ধর্মঘট সংগঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বিহারে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ ধর্মঘট শুরু হয় এবং ১৯৯৫ সালেও ওই ধর্মঘট চলতে থাকে। উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং সরকারের শাসনে কর্মচারী-শিক্ষক ৬ ডিসেম্বর ধর্মঘট শুরু করেন এবং ২৪ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তার সমাপ্তি ঘটে। ৫৫ দিন পরে বিহারে সাফল্যের সঙ্গে ধর্মঘটের সমাপ্তি হয় এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের ভিত্তিতে ধর্মঘট প্রত্যাহার হয়।

বিমা কর্মচারীদের সমস্ত সংগঠনগুলি অল ইণ্ডিয়া ইনসিওরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, অল ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য তিনটি সংগঠন ও অফিসার্সদের ফেডারেশন এবং এজেন্টদের অ্যাসোসিয়েশন এক যৌথ কমিটি গঠন করে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ এক দিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘট পালন করে দাবিসনদ মীমাংসা, পেনশন প্রকল্প চালু করা, বোনাস প্রদান এবং বিমা-শিল্পের বেসরকারিকরণ রোধের দাবিতে

এই ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ মার্চ, ১৯৯৯ ওই একই দাবিতে যৌথ কমিটির আহ্বানে বিমা কর্মচারীরা পুনরায় ধর্মঘট পালন করেন।

দেশব্যাপী সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ১৯৯৫ সালে ১৯ জুন সারা দেশে ৪,৫০,০০০ টেলিকম কর্মচারীর অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট শুরু হয় টেলিকম বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে। সংসদে ন্যাশনাল টেলিকম পলিসি সংখ্যাধিক্যের জোরে অনুমোদনপ্রাপ্ত হলে সরকার টেলিকম শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণের পথে অগ্রসর হয়। সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনটি সর্বভারতীয় কর্মচারী ইউনিয়ন— ন্যাশনাল ফেডারেশন অব টেলিকম এমপ্লয়িজ, ন্যাশনাল টেলিকম এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন ও ভারতীয় টেলিকম ফেডারেশন যৌথ ভাবে এই ধর্মঘটের আহ্বান দেয়। দিল্লি ও মুম্বইতে আংশিক ধর্মঘট হয় কিন্তু সারা দেশে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গে টেলিকম ধর্মঘট সর্বাত্মক হয়। তিনটি ইউনিয়নের সঙ্গে সরকার একটি চুক্তি করে। ধর্মঘট ২৩ জুন প্রত্যাহৃত হয় কিন্তু যে সকল দাবিতে ধর্মঘট, সেই দাবিগুলির বেশ কয়েকটি চুক্তিতে উপেক্ষা করা হয়। সে কারণে ধর্মঘটের নেতৃবৃন্দকে বহু ক্ষেত্রে কর্মচারীদের দ্বারা হেনস্থা হতে হয়।

ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের ক্ষেত্রে ও ধর্মঘটের ইতিহাসে ১৯৯১—৯৫ সাল, এই পর্বটি ছিল জীবন-জীবিকার, শ্রেণিসংগ্রামের এবং নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক আক্রমণের প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

১৯৯৮ সালের শুরুতেই প্রথম বৃহৎ ধর্মঘটটি সংঘটিত হয় ৫ জানুয়ারি ডাক বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা। ৩.৫ লক্ষ এক্সট্রা ডিপার্টমেণ্টাল কর্মচারীদের (ইডি এমপ্লয়িজ) নিয়মিত করার বিষয়ে সরকার নিযুক্ত তলোয়ার কমিটি যে সুপারিশ করেছিল তা কার্যকর করার দাবিতে দেশের ৬ লক্ষ ডাক কর্মচারী ওই দিন দেশব্যাপী প্রতীক ধর্মঘট পালন করে।

১৯৯৮ সালের ২৩ জুন দিল্লিতে গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চের বৈঠকে যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ৩ জুলাই সংসদের বর্ষকালীন অধিবেশন শুরুর প্রথম দিন ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ওই দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের টেড ইউনিয়নগুলি যৌথ ভাবে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করে।

পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়। এই রাজ্যে ধর্মঘট শুধু

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের ডাকে ৩ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে এক দিনের রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

ডাক বিভাগের ইডি কর্মচারীদের আন্দোলন চলছিল। ডাক বিভাগের এই ইডি কর্মচারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। এই অবস্থায় ডাক বিভাগের কর্মচারীদের সংগঠনসমূহ যৌথ ভাবে ইডি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির সমর্থনে ৮ জুলাই থেকে ৫ লক্ষ কর্মচারী সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু করে। আট দিন লাগাতার ধর্মঘট চলার পর সরকার ও কর্মচারীরা মীমাংসায় উপনীত হয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নির্দেশে ভারত সরকার যে আর্থিক সংস্কার নীতি কার্যকর করছিল এবং তার ফলে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্বিষহ অবস্থা তৈরি হল, তার প্রতিরোধে সংগ্রাম ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে। ৫৬টি ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চের আহ্বানে ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৮ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটে শ্রমিক-কর্মচারীর অংশগ্রহণ ছিল সেই সময় পর্যন্ত সর্বকালীন রেকর্ড।

বলা বাহুল্য পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের শ্রেণিসচেতন সংগ্রামী মানসিকতার কারণে এবং রাজ্যে বামফ্রন্টের মতো শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ক্ষমতাসীন থাকার ফলে প্রতিটি ধর্মঘটই এ-রাজ্যে সর্বাত্মক আকার ধারণ করেছে।

বিশ্বায়ন ও শ্রম আইন পরিবর্তন

গত দশ বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন পরিবর্তনে উঠেপড়ে লেগেছে। আইন পরিবর্তনের জন্য সরকারি উদ্যোগ আগেও ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে এই উদ্যোগে গতি আনার চেষ্টা হয়। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ জোট ক্ষমতাসীন হওয়ায় পূর্ণ উদ্যমে শ্রম আইন পরিবর্তনের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এমনকী, কেন্দ্রীয় সরকারের তাড়া এত বেশি যে, সাংবিধানিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধান উপেক্ষা করেই শ্রম আইন সংশোধনে তারা বদ্ধপরিকর। কেন এত দ্রুততার সঙ্গে শ্রম আইন পরিবর্তনের পথে সরকার এগোচ্ছে, আর এই পরিবর্তনের প্রকৃত কার্যকারণ সম্পর্ক ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলি এবং পুঁজির ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছর জুন মাস থেকে শ্রম আইন সংক্রান্ত যে আইনগুলির সংস্কার বা পরিবর্তনের প্রয়োজন সরকার একান্ত জরুরি মনে করছে সেগুলি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট-১৯৪৮, মিনিয়াম ওয়েজেস অ্যাক্ট-১৯৪৮, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট-১৯৪৭, লেবার ল'জ একজেমশন ফ্রম ফারনিশিং রিটার্ন অ্যাণ্ড মেনটেইনিং রেজিস্টার বাই সারটেন এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট-২০১৪, অ্যাপ্রেনটিস অ্যাক্ট-১৯৬১ ইত্যাদি আইনদ বদলের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শ্রম আইন বদলের উদ্দেশে সংশোধনসহ

পরিবর্তিত আকারে শ্রম আইন রাজ্যসভায় পেশ করা হয় ২০১১ সালে, তখন ক্ষমতায় ছিল ইউপিএ-২ সরকার।

গত ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের পরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার দ্রুততার সঙ্গেই নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কার নীতি রূপায়ণে পদক্ষেপ করেছে। নির্বাচনের পূর্বেই বিজেপি শিল্পমহলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, ক্ষমতায় এলে আর্থিক সংস্কার নীতি কঠোর ভাবে কার্যকর হবে। কর্পোরেট শিল্পগোষ্ঠী কোনও রকম রাখঢাক না করেই প্রকাশ্যে নরেন্দ্র দামোদর মোদীকে তাদের মুখপাত্র স্থির করেই নির্বাচনে জেতাতে সব ধরনের মদত দিয়েছে। বিনিয়োগ করেছে শত শত কোটি টাকা। নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কার নীতির অন্যতম পদক্ষেপ শ্রম আইন সংস্কার।

শ্রম আইন সংস্কারের পদক্ষেপে সর্বাধিক উল্লসিত দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণি। এই মালিকদের স্বার্থেই শ্রম আইন পরিবর্তনে উদ্যোগী ভারত সরকার। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শ্রম আইন পরিবর্তনে সরকার উদ্যত। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে শ্রমের বাজার হবে সর্বতো ভাবেই সঞ্চরণশীল বা প্রসারমান (ফ্লেক্সিবল)।

বিশ্বায়ন, অসরকারিকরণ ও উদার আর্থিক সংস্কার নীতি ভারতে কার্যকর হয়েছে ১৯৯১ সাল থেকে। সরকারি প্রচারে বলা হয়েছে উন্নয়নের সোপান হল বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, অসকারিকরণ, সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিলোপ এবং বাজারের প্রসারণ। সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে দেশে দেশে আন্দোলন চলছে। ভারতেও সেই আন্দোলন গড়ে উঠেছে দেশের প্রান্তে প্রান্তে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অসরকারিকরণ হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমাদের দেশে সব থেকে বেশি কর্মসংস্থান হয় ক্ষুদ্র শিল্পে। ঢালাও আমদানির ফলে ক্ষুদ্র শিল্পের নাভিশ্বাস উঠেছে। বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদন শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতি ্রন্দ্বিতায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রথম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় ২৯ নভেম্বর ১৯৯১। এই ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই বিশ্বব্যাঙ্ক-আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশিত নয়া আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির

ব্যাপর ও জঙ্গি লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে যা গত ২৩ বছরে আরও বিস্তার ও তীব্রতা লাভ করে। এই সময়েই অসরকারিকরণ ও দফতর সঙ্কোচন ও কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ধারাবাহিক ভাবেই শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠনসমূহ যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছে। শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ যত গভীর হয়েছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিস্তারও ঘটেছে। গত ২০১৩ সালে ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘটে সারা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রতিরক্ষা, ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীরাও শামিল হয়েছিলেন। কোনও কোনও রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘট পর্যন্ত পালিত হয়েছে।

২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী পুনরায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারী সংগঠনসমূহ। এই ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়েছে। এই আন্দোলনগুলিতে দাবিসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান হবে না। কারণ এই সংগ্রাম বিশ্বায়নের ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আর্থিক সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে। এই লড়াই সরকারকে নীতি বদলে বাধ্য করার লড়াই। শ্রমজীবী জনসাধারণকে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পথেই চলতে হবে।

'বন্‌ধ'-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৭ সালের ২৮ জুলাই কেরালা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত 'বন্‌ধ' বেআইনি ঘোষণা করে যে রায় দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় বহাল রাখেন। স্বাভাবিক ভাবেই বন্‌ধ বিরোধী পুঁজিপতিশ্রেণি, বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, আমলাতন্ত্র ও বহু সংবাদমাধ্যম সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাতে থাকে। শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রামের হাতিয়ার ধর্মঘট ও বন্‌ধ-এর উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে নতুন করে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের উপরেও আক্রমণ নেমে আসে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে শাসনক্ষমতা পরিবর্তনের পর যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়, তারাও ধর্মঘটবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে কোনও ধর্মঘট ডাকা হলে, সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে সামনে রেখে শাসকদলের অনুগামী আইনজীবীদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে একটা করে মামলা রুজু করা হয়।

বন্‌ধ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আদালত বলার চেষ্টা করেছে যে, 'বন্‌ধ' সংঘটিত হয় জোর-জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, বন্‌ধ-এর আহ্বান জনসাধারণের উপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে। অতএব 'বন্‌ধ'-এর আহ্বান জানানো বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই রায়কে ব্যবহার করে অনেক রাজ্য সরকার ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে।

সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কারণ রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষ থেকে সর্বস্তরেই এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বন্‌ধ নিষিদ্ধ করায় রায় ঘোষণার দিনটিকে অনেক শ্রমিক সংগঠনই কালাদিবস বলে ঘোষণা করে।

ভারতে 'বন্‌ধ' কোনও নতুন আবিষ্কার বা ঘটনা নয়। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে বহু সময় হরতালের ডাক দিয়েছেন, যা কার্যত 'বন্‌ধ'-এ পরিণত হয়েছে। সাধারণ ধর্মঘটের প্রচলিত ধারণা ছিল, কলকারখানা ও অফিস, দফতর ও আদালতের কাজ বন্ধ করে দেওয়া। গান্ধীজি প্রবর্তিত হরতালের অর্থ ছিল সর্বস্তরে সার্বিক বন্‌ধ অর্থাৎ বন্‌ধ হয়ে উঠেছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের।

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রেণিস্বার্থের দৃষ্টিতে পরিচালিত হয়, শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থের বিরোধিতা করে থাকে, সে রকম রাষ্ট্রযন্ত্রের বিচার বিভাগীয় শাখাও শ্রেণির স্বার্থের রক্ষাকর্তা।

গণসংগঠন সমূহের জাতীয় মঞ্চের আহ্বানে ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী রায়ের প্রতিবাদে দিল্লিতে বিশাল কর্মচারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে চলতে থাকে লাগাতার বিক্ষোভ, সভা, সমাবেশ। রাজ্যের সাধারণ মানুষও সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। পরবর্তী কালে ২০১১ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর একাধিক ধর্মঘট হয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি হুমকি, চাকুরিচ্যুতির ফরমান ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই ধর্মঘট কার্যত বনধে পরিণত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ঘটে এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি কিছুটা উচ্চস্তরে পৌঁছয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভয়াবহ চিত্র নগ্ন হয়ে ওঠে। শ্রমজীবী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। তার ফলে যুদ্ধ পরবর্তী কালে শুরু হয় ভারতের শ্রমিকশ্রেণির সুসংবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সৃষ্টি এবং সংগঠিত ও উন্নততর শ্রমিক আন্দোলন। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেই ইংরেজ শাসকরা প্রত্যক্ষ করেছিল শ্রমিক বিক্ষোভ, আন্দোলন আর ধর্মঘটের প্রবাহ। এ বিষয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ সালে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন— 'বস্তুত ভারতের শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবের প্রথম যুগেই এই নতুন সৃষ্টি শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে চরম ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রত্যাঘাত স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মঘটের রূপেই মূর্ত হত। এমনকী অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া এবং জঘন্য বর্বর পরিবেশে যে কয়লাখনি শ্রমিকদের কাজ করতে হত, তারাও এই প্রাথমিক স্তরে প্রায়শই বিক্ষিপ্ত ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করত। স্বদেশি আন্দোলন এই প্রবণতাকে তীব্র করেছিল এবং কিছুটা সংঘটিত করেছিল।' ভারতের শ্রমিকশ্রেণির প্রাক্ মহাযুদ্ধকালীন আন্দোলনের

ধারাগুলি ছিল কার্যত যুদ্ধের পরবর্তী কালে সংঘটিত সংগ্রামের উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রস্তুতি। প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালীন পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব যে উদ্দীপনা ও শ্রমিকশ্রেণির চেতনার প্রসারে সেই সময়ের পরিস্থিতি ও পরিবেশের অভ্যন্তরে যে উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল তারই ফলে ভারতে গণসংগ্রাম ও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিস্তার ঘটে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিশ শতকের শুরুতেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'রাওলাট' আইনের প্রতিবাদে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ধর্মঘট ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল পালিত হয়। স্বয়ং গান্ধীজি এই ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘটের মাত্র ৭ দিন পরেই ঘটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

এই পটভূমিকায় জন্মলাভ করে প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এআইটিইউসি)। এআইটিইউসি-র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিকশ্রেণির সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসাবে।

এআইটিইউসি প্রতিষ্ঠায় ১৯২০ সালে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বে। শ্রমিকশ্রেণির সমস্যাকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার বোধে এবং বিশাল সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণি যাঁরা এখনও অসংগঠিত অবস্থায় আছে, কিন্তু বিক্ষুব্ধ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃত্ব শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। সেই সময় শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত করতে বাল গঙ্গাধর তিলক পুরোভাগে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন লালা লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। বাল গঙ্গাধর তিলক এআইটিইউসি-র প্রথম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর সভাপতির ভাষণে এক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছিল। বিশিষ্ট জাতীয় কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই প্যাটেলের উপস্থিতি ছিল অধিবেশন মঞ্চে। কিন্তু সম্মেলন মঞ্চে তিলককে দেখা যায়নি। কারণ ১ অগস্ট ১৯২০ তাঁর মৃত্যু ঘটে। সে কারণে সম্মেলনের নির্ধারিত দিন ২২ অগস্ট থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর নির্দিষ্ট হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, এআইটিইউসি প্রতিষ্ঠার সম্মেলন মঞ্চে জাতীয়

কংগ্রেসের প্রথম সারির প্রায় সব নেতাই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি এই সম্মেলনে আসেননি, কোনও বার্তাও পাঠাননি। তার একটি কারণ হতে পারে, গান্ধীজি নিজে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি নীতি ও কৌশলগত ভাবে শ্রমিক সংগঠন সমূহের ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে ছিলেন না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্মেলন-মঞ্চে বিশিষ্ট সমাজসেবীরাও যেমন ছিলেন, তেমন উপস্থিত ছিলেন লক্ষপতি ধনী ব্যক্তিরাও।

এআইটিইউসি-র জন্মের পর থেকে সংগঠনের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রাম চলে এসেছে। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে এআইটিইউসি তিন ভাগে বিভক্ত হলেও এরই মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টাও দেখা গেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে এই সময় দেশে নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির মধ্যে বিভেদের কারণে নতুন ট্রেড ইউনিয়নগুলি কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স ও আইনকানুনের মাধ্যমে ধর্মঘটকে বেআইনি করার পদ্ধতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সালে ১৪৫টি ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিলেন ১,৪৪,২১৭ জন শ্রমিক এবং ১০ লক্ষের বেশি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১৫৭টি এবং ১,৬৮,০২৯ জন শ্রমিক ধর্মঘটে যুক্ত ছিলেন এবং ৫৩,৫৮,০৬২ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ের সর্ববৃহৎ ধর্মঘট সংঘটিত হয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে (বিএন রেলওয়ে)। ১৯৩৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর ২৬,৫০০ জন শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মঘট ১৯৩৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে এবং ১০ লক্ষের বেশি কর্মদিবস নষ্ট হয়।

১৯৩৬ সালে এআইটিইউসি-র পঞ্চদশ সম্মেলন ১৭ ও ১৮ মে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। ওই অধিবেশনে শিবনাথ ব্যানার্জি সভাপতি ও মনিবেন কারা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এআইটিইউসি-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণির জাতীয় সংগঠন রূপে। কোনও রাজনৈতিক দলের অনুসারী হিসেবে নয়। ১৯২৯ সালে এআইটিইউসি-র ভাঙন ঘটেছিল কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা থেকেই। সেই সময় এন এম যোশী প্রমুখের মতো বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

চর’ আখ্যা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এআইটিইউসি-র প্রথম ভাঙন অনিবার্য হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্রতিটি ক্ষেত্রে যখনই এআইটিইউসি-কে একদলীয় সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে, ততবারই ভাঙন ধরেছে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে এআইটিইউসি-র তিনবার বিভাজন ঘটেছে, কিন্তু ঐক্য প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে ও সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে মাঝেমধ্যেই এআইটিইউসি বিভক্ত হয়েছে। আবার আলোচনার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

এআইটিইউসি-র জন্মের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সংগঠনের একটি ঐক্যবদ্ধ অবয়ব থাকলেও অধিবেশনগুলির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল। এআইটিইউসি-র প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা গিয়েছিল পরবর্তী কালে সম্মেলনগুলিতে তা বিশেষ ভাবে অনুপস্থিত ছিল। তৃতীয় সম্মেলন থেকে দেখা গেল কল-কারখানায় কাজ-করা শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে মধ্যবিত্ত সংগঠকদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা যেমন দেখা যায়নি, তেমনই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল। বাস্তবে এই সময় ‘এআইটিইউসি একটা উপরতলার সংগঠন হিসেবেই পরিণত হয়েছিল এবং শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা অপেক্ষা কিছু নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবেই এই সংগঠন ব্যবহৃত হচ্ছিল।’ (সুকোমল সেন, ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, পৃ. ২০৫)।

স্বাধীনতার পরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটল। জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেই যে সকল রাজনৈতিক শক্তি কাজ করে যাচ্ছিলেন, তারা সকলেই পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দলের অবস্থান এবং নীতি আদর্শ ঘোষণা করলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতপার্থক্য ক্রমশই সুস্পষ্ট হল। এআইটিইউসি-র অভ্যন্তরে শ্রমিক নেতৃত্বের মধ্যেও মতাদর্শগত বিতর্ক তীব্র আকার ধারণ করল। এই মতাদর্শগত সংঘাতের পরিণতিতেই ১৯৪৭-৪৮-৪৯, এই তিন বছরেই এআইটিইউসি ভেঙে গড়ে উঠল আরও তিনটি কেন্দ্রীয় সংগঠন আইএনটিইউসি, এইচএমএস ও ইউটিইউসি।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আইএনটিইউসি)

ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া ১৮৫০—১৯০০ সময়পর্বে শুরু হয়। ভারতীয় টেক্সটাইল শ্রমিকদের কর্ম-সময়ও বলবৎ করা হয়। এই পর্বে সদ্য গড়ে-ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশ হয়েছিল ধীরগতিতে। কাজের ঘণ্টা ছিল অনেক বেশি, কাজের পরিবেশ ও শ্রমিকদের বেঁচে থাকার পরিস্থিতি ছিল জঘন্য। মালিকেরা উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভ ছাড়া কিছুই বুঝত না। অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজের ঘণ্টা ও চাকরির শর্তাবলির কিছু পরিবর্তন করা হল ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট সংশোধনের মাধ্যমে। এইসময় অনেক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২০ সালে প্রথম জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নরূপে আত্মপ্রকাশ করে এআইটিইউসি। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বহু নেতাই স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে এন এম যোশীর উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রণয়ন হয়, যা বলবৎ হয় ১৯২৭ সাল থেকে। ১৯০০—১৯৪৬ সাল পর্বে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংঘটিত বিকাশ ঘটতে থাকে ও রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯১৮—১৯২৩ সালে আমেদাবাদে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় সুতাকল শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯২০ সালে গঠিত হয় টেক্সটাইলস লেবার অ্যাসোসিয়েশন।

১৯৪৭ সালের ১৮ এপ্রিল হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘের সম্পাদক গুলজারিলাল নন্দা দেশের সব জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পত্র দিয়ে জানান যে, এআইটিইউসি-র ভূমিকা শ্রমিকবিরোধী ও জাতীয়তাবিরোধী। সে জন্য একটা নতুন সংগঠন (এআইটিইউসি থেকে বেরিয়ে এসে) গড়ে তোলা দরকার, যারা শ্রমিকশ্রেণির জন্য প্রকৃতই আওয়াজ তুলতে পারবে। নন্দার চিঠিতে আরও বলা হয় ১৯৪৭ সালের ৩ ও ৪ মে সভা ডাকার কথা, বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও শ্রমিকশ্রেণি ও দেশের স্বার্থরক্ষার্থে কী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হবে।

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব সভাগৃহে ১৯৪৭ সালের ৩ মে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং আচার্য জে বি কৃপালিনী এই সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, শংকর রাও দেও, জগজ্জীবন রাম, অরুণা

আসফ আলি, খান্দুভাই দেশাই, গুলজারিলাল নন্দা, সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সকল জাতীয় নেতাদের উপস্থিতিতে ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি আইএনটিইউসি গঠনের মূল প্রস্তাব পাঠ করেন। এ প্রস্তাব সমর্থন করেন মাইকেল জন, এই সম্মেলন থেকে সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি ও খান্দুভাই দেশাইকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ও ১৯ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। গঠনকালীন সময়ে আইএনটিইউসি-র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ২০০ এবং সদসসংখ্যা ছিল ৫,৭৫,০০০।

এ বিষয়টি অনস্বীকার্য, আইএনটিইউসি গঠনের সময় দেশের কেন্দ্রীয় শাসক দল প্রত্যক্ষ কংগ্রেসের সাহায্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেস জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। কার্যত কংগ্রেস হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন মতাবলম্বী দেশপ্রেমিক জনসাধারণের একটি বৃহৎ মঞ্চ। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস পৃথক ভাবে কোনও গণ সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবেনি। কিন্তু যখন দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা কংগ্রেসের হাতে এসে পড়া নিশ্চিত হয়ে গেল, তখনই কংগ্রেস নেতৃত্ব অনুভব করেন সরকারের অনুগামী একটি শ্রমিক সংগঠন প্রয়োজন। এই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ভাবনা থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব গড়ে তোলেন আইএনটিইউসি।

কিছুকাল পূর্বে আইএনটিইউসি-র সম্মেলন থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আইএনটিইউসি কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। আইএনটিইউসি ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস-এর সঙ্গে যুক্ত।

১৯৪৯ সালে দেশে চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। ১. এআইটিইউসি ২. আইএনটিইউসি ৩. এইচএমএস ৪. ইউটিইউসি।

হিন্দ মজদুর সভা (এইচএমএস)

১৯৪৭ সালে এআইটিইউসি ভেঙে জাতীয় কংগ্রেসের অনুগামীরা আইএনটিইউসি গঠন করার পরে সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও অনুগামীবৃন্দ আরও একটি পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—এইচএমএস।

হিন্দ মজদুর সভা ১৯৪৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর হাওড়ায় সমাজবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক অনুগামী এবং স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, এম এন রায়-এর অনুগামী ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার এবং স্বাধীন শ্রমিক শ্রমিক আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসাওন সিনহা, অশোক মেহতা, আর এস রুইকর, মনিবেন কারা, শিবনাথ ব্যানার্জি, আর এ খেদগিকর, টি এস রামানুজম, ভি এস মাথুর, জি জি মেহতা প্রমুই বিশিষ্ট শ্রমিক নেতৃবর্গ ছিলেন হিন্দ মজদুর সভার প্রতিষ্ঠাতা। আর এস রুইকর সভাপতি ও অশোক মেহতা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এম এন রায়পন্থী এবং সমাজতন্তরী হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতকে নিজ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

হিন্দ মজদুর সভা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ কর্মনিয়োগকারী মালিকপক্ষ এবং সরকারের সঙ্গে যুক্ত না থেকে স্বাধীনতায় (স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষায়) বিশ্বাসী। তার মানে এই নয় যে, হিন্দ মজদুর অরাজনৈতিক, কিন্তু এই সংগঠন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হতে স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বর্তমানে (২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী) হিন্দ মজদুর সভার সঙ্গে ১৬টি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন আছে। হিন্দু মজদুর সভা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইণ্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আইসিএফটিইউ-এপিআরও-র দ্বারা স্বীকৃত। বর্তমানে ইণ্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ডব্লুসিএল-র সংযুক্তিকরণের ফলে বর্তমানে যথাক্রমে আইটিইউসি এবং আইটিইউসি-এপিআরও নামে পরিচিত। হিন্দ মজদুর সভা, সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল এর সদস্য যা সার্ক দেশগুলির শ্রমিক সংগঠন নিয়ে গঠিত।

হিন্দ মজদুর সভার মূল আদর্শ

ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন জাতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক শাখা হিসাবে পরিচিত। তখন হিন্দ মজদুর সভা একমাত্র ব্যতিক্রমী সংগঠন, যা কোনও প্রকার রাজনৈতিক দলের অধীনে নয়। এইচএমএস ইউনিয়ন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন মার্গের দিশারী। যা রাজনৈতিক দলতন্ত্র হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের পথ দেখায়।

১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে এইচএমএস-এর প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে গৃহীত, স্বাধীন সত্তার ঐতিহ্য বিগত ছয় দশকে অম্লান থেকেছে।

এইচএমএস গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সংগঠন মনে করে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতাকে বলিপ্রদত্ত করে পাওয়া অর্থনৈতিক সুবিধা প্রায়শই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অন্য দিকে গণতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে না, যদি না মানুষ তার জীবন উন্নয়নের সংগ্রামে বা আন্দোলনের পথ না নেয়। তাই এইচএমএস-র কাছে কখনও রুটি (খাদ্য) ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। এইচএমএস-র মতে খাদ্য ও স্বাধীনতা অবিচ্ছিন্ন। এইচএমএস গণতান্ত্রিক সমাজবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী যা অর্থনৈতিক সত্তা ও শোষণের অবসান নিশ্চিত করবে।

প্রথম সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি হলেন আর এস রুইকার, সহসভাপতি শিবনাথ ব্যানার্জি, মনিবেন কারা, সাধারণ সম্পাদক অশোক মেহতা, কর্মসমিতিতে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলি, কোষাধ্যক্ষ আর এ খেদগাকির।

ইউটিইউসি-র প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার পরে এআইটিইউসি-তে তিনটি বড় বিভাজন হয়েছিল। শেষ বিভাজনটি ঘটে ১৯৪৯ সালে ইউটিইউসি গঠনের মাধ্যমে। এআইটিইউসি-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি মৃণালকান্তি বসু তখন আর এআইটিইউসি-তে থাকতে পারেননি।

আরএসপি, বলশেভিক পার্টি, এসইউসি, আরসিপিআই, পোর্ট ট্রাস্ট ইউনিয়ন-সহ বিশ্বনাথ দুবে, সুধীন প্রামাণিক, সুধা রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গ মৃণালবাবুর কাছে পরবর্তী কার্যক্রমের পরামর্শ নিতে হাজির হন। এঁরা সকলেই মৃণালকান্তি বসুর নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন এবং সকলেই সহমত ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নের দলীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা প্রয়োজন। মৃণালকান্তি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিধানচন্দ্র রায় যখন মন্ত্রিসভা গড়ছেন তখন প্রেস এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ইন্দু সরকার মারফত মৃণালবাবুকে ডেকে পাঠান এবং শ্রমমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। মৃণালবাবু তখন বিধানচন্দ্র রায়কে বলেছিলেন আমি একজন সাংবাদিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, আমি এই প্রস্তাব কোনও মতেই মানতে পারছি না। শুধু তাই নয়, একটা বিশেষ অনুরোধও থাকল এবং তা হল কোনও ট্রেড ইউনিয়ন

নেতাকে শ্রমমন্ত্রী করবেন না। মৃণালবাবুর সর্বাধিক দায়বদ্ধতা ছিল শ্রমিকশ্রেণির প্রতি। ট্রেড ইউনিয়ন ও মন্ত্রিত্ব এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়।

হিন্দ মজদুর সভা গড়ে ওঠার পদ্ধতি ও কার্যক্রমের সঙ্গে মৃণালকান্তি বসু ও তার সহযোগী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সহমত হতে পারেননি। তাঁরা ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কমিটি নামে একটি সংগঠন গঠন করলেন। পরের বছর ১৯৪৯ সালের ২৯, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত শ্রমিক সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হল ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস বা ইউটিইউসি। ১ মে প্রকাশ্য সমাবেশে মৃণালকান্তি বসু ঘোষণা করলেন নতুন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ইউটিইউসি-র জন্ম। এ আইটিইউসি-র ভেতরে থাকা শেষ সক্রিয় বামপন্থী অংশ এ ভাবেই বেরিয়ে এল। এআইটিইউসি হয়ে পড়ল কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব গণসংগঠন। ইউটিইউসি-তে কর্ম পরিচালনার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হল এবং মৃণালকান্তি হলেন মহাসচিব বা জেনারেল সেক্রেটারি। যে কোনও শ্রমিক আন্দোলনে বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান হত মৃণালবাবুর উপস্থিতিতে সম্পাদকমণ্ডলীর সভার মাধ্যমে।

ইউটিইউসি গঠনের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির যে নেতৃত্ব যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বনাথ দুবে, সুধীন প্রামাণিক, ক্ষেমেশ চক্রবর্তী, যতীন চক্রবর্তী, সীতা শেঠ, বিশিষ্ট নেত্রী সুধা রায়, ননী ভট্টাচার্য বোম্বাইয়ের কে টি শাহ, পদ্মনাভন ও এম রসিদ, কেরালার শ্রীকান্তন নায়ার প্রমুখ। ইউটিইউসি-র সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরমত সহিষ্ণুতা, সততা, পরার্থপরতা— যে গুণগুলি না থাকলে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না।

ইউটিইউসি-র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘোষণা করে ১৯৪৯ সালের ১ মে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন— স্বাধীনতার পরে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটেছে। বিদেশি শাসকদের প্রত্যক্ষ শাসন না থাকলেও দেশিয় পুঁজিপতিদের শাসন কায়েম হয়েছে। দেশিয় ও বিদেশি পুঁজিপতিদের শোষণ অব্যাহত আছে। পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের স্বার্থেই রাষ্ট্রব্যবস্থা সক্রিয়। শাসক পরিবর্তন হলেও শোষণের পরিবর্তন হয়নি। শ্রমিকশ্রেণির সামনে লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রকাশ করল দেশের চতুর্থ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। বর্তমানে ইউটিইউসি

ভারতের অন্যতম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল আরএসপি-র দ্বারা প্রভাবিত।

ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) দেশের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন। ১৯৫৫ সালের ২৩ জুলাই ভোপালে বিএমএস-র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংগঠনের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। যাঁর সংগঠন সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য ছিল, যেহেতু বিএমএস একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, তাই তিনি এই মঞ্চে থাকবেন না। প্রয়াত দত্তপন্থ ঠেংড়ি ছিলেন বিএমএস-র প্রতিষ্ঠাতা। যদিও এই সংগঠন ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নরসিংহ রাও সরকারের আমলেই বিএমএস ভারতের সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি পায়। ভারতীয় মজদুর সংঘের অভ্যন্তরে পদাধিকারী নির্বাচনে কোনও প্রকার নির্বাচন হয় না। মনোনয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আসীন হয়। বিএমএস-র নীতি আদর্শ মেনে ৩০০টি ফেডারেশন সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে কাজ করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে, বিএমএস-এর সাংগঠনিক ব্যাপ্তির কারণ হল সকলের প্রতি আস্থা। বিএমএস-এর নেতৃত্বে কোনও বিধায়ক ও সাংসদ নেই। এখানেই এই সংগঠন অন্যান্য শ্রমিক সংগঠন থেকে স্বতন্ত্র। একজন বিধায়ক বা সাংসদ নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি রূপেই নির্বাচিত হন। সংগঠনের নেতৃত্বে বিধায়ক বা সাংসদ থাকলে রাজনৈতিক দলের দ্বারা সংগঠনের প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে কারণে বিএমএস-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও বিধায়ক ও সাংসদ সংগঠনের নেতৃত্বে নেই। বিএমএস কর্মে বিশ্বাস করে। তিনটি মূল আদর্শ: ১. শ্রমের রাষ্ট্রীয়করণ ২. শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ ৩. শ্রমিকায়ন (লেবারাইজেশন অব দি লেবার)।

বিএমএস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিএমএস-ই একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন যারা আওয়াজ তুলেছে 'চলো গ্রামে চলো'। বিএমএস মনে করে বর্তমানে গ্রামোন্নয়নই রাষ্ট্রের মূল প্রয়োজন। গ্রাম উন্নত হলে তবেই শহর ও রাষ্ট্র উন্নত হবে। এটাই সেই বড় প্রকল্প, যার উপর বিএমএস কাজ করছে।

বিএমএস প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে প্রত্যক্ষ ভাবে বিজেপির সঙ্গে তাদের

কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আরএসএস-র সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে অপ্রত্যক্ষ ভাবে বিজেপি-র দ্বারা প্রভাবিত।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায় হচ্ছে রাজনৈতিক দলের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে গণসংগঠন সমূহের বিভাজন। রাজনৈতিক দলের বাধ্যবাধকতায় ট্রেড ইউনিয়নের ভাঙাগড়া। পরবর্তী কালে সোস্যালিস্ট পার্টির বিদগ্ধ নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধের কারণে হিন্দ মজদুর সভা ভেঙে হিন্দ মজদুর পঞ্চায়েতের পুনরায় আবির্ভাব ঘটল। আরএসপি থেকে মতবিরোধের কারণে কিছু সদস্য বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন এসইউসি নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল। প্রচলিত রাজনীতির ধারা অনুসারে ইউনাইটেড ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে এসইউসি-র নেতৃত্ব ও কর্মীরা মতবিরোধের জন্য বেরিয়ে গিয়ে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে গঠন করলেন আরও একটি ইউটিইউসি, পরবর্তী কালে যাদের চিহ্নিত করা হত ইউটিইউসি (লেনিন সরণি) নামে। এসইউসি প্রভাবিত ইউটিইউসি-র দফতর লেনিন সরণিতে হওয়ার কারণে তাদের সংগঠনের নামের পাশে লেখা হত লেনিন সরণি কথাটি। বর্তমানে এই সংগঠন এআইইউটিইউসি নামে পরিচিত। সংগঠনের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুধীন প্রমাণিক।

সিআইটিইউ প্রতিষ্ঠা

১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের পরে গঠিত হল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। পার্টি ভাগ হলেই গণসংগঠনও ভাগ হবে— এই ধারা অনুসারে এআইটিইউসি ভেঙে আরও একটি ট্রেড ইউনিয়ন ১৯৭০ সালে মে মাসে গড়ে উঠল 'সেণ্টার অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সিআইটিইউ)। পরবর্তী সময়ে আরও ট্রেড ইউনিয়ন জন্ম নিয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজস্ব রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মসূচি অনুসারে গণসংগঠন গড়ে তুলেছে। রাশিয়া ও চিনের মতবিরোধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও বিভক্ত হল।

সিপিআই যখন দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার মুখে তখনই শুরু হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের ভিতর মতবিরোধ ও ভাঙন। এআইটিইউসি-র ভেতরে দীর্ঘকাল মতাদর্শগত বিরোধ চলেছিল। যে নেতৃত্ব সিপিআই (এম) গঠন করলেন,

কার্যত তাদেরই উদ্যোগে গঠিত হল সিআইটিইউ। সিআইটিইউ-র প্রথম সভাপতি হলেন বি টি রণদিভে ও সাধারণ সম্পাদক হলেন পি রামমূর্তি। বহু ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙার রাজনীতি মতাদর্শগত সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরস্পরের বিরুদ্ধে শারীরিক আক্রমণও সংগঠিত হয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সিআইটিইউ পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিক আন্দোলনে সিআইটিইউ-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ক্রমাগত ট্রেড ইউনিয়ন ভাঙার ফল শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়নি। কার্যত বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহ শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ প্রচারের বাহন হিসাবেই কার্যকর আছে। এ ভাবেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণি পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক দল ও আদর্শের বিভিন্নতার শিকার হল এবং শ্রমিকশ্রেণির যে ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল অনিবার্য ভাবেই সেই ঐক্য নির্মম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

অল ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ট্রেড ইউনিয়নস (এআইসিসিটিইউ)

এআইসিসিটিইউ-এর ইস্তাহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পুঁজি বনাম শ্রমের দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রমের অন্তর্নিহিত সংঘাতই শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের মূল উৎস। তিনটি বিষয়ের উপরে এআইসিসিটিইউ গুরুত্ব দিয়েছে।

ক. একটি স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ভারতের শ্রমিকশ্রেণিকে উঠে আসার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সামাজিক ভূমিকাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

খ. ভারতের শাসকশ্রেণির নীতিগুলির সঙ্গে স্পষ্ট সীমারেখা টেনে শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শগত শ্রেষ্ঠত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

গ. ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকদের উদ্যোগ তদারকি এবং আধিপত্যের দ্বারকে খুলে দেবার জন্য একটি নতুন কাঠামো হাজির করার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিকে বিকাশ করা।

ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তির প্রশ্নে দুরারোগ্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠীর নীতিহীন আঁতাতের বিপরীতে এই কেন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন মঞ্চে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শগত গোষ্ঠীগুলির সহাবস্থান ও সুস্থ

প্রতিযোগিতাকে স্বীকার করে।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে একটি বিপ্লবী কেন্দ্রের বিকাশ ঘটানোর প্রক্রিয়ায় বিহারের ধানবাদে ১৯৮৭-র ২৫-২৬ জুলাই কেন্দ্রীয় স্তরের কনভেনশনের মাধ্যমে এআইসিসিটিইউ সূচনা হয়। প্রাথমিক ইস্তাহারে এই সংগঠন সমাজতন্ত্রকে তার লক্ষ, সংগ্রামকে তার পথ এবং ঐক্যকে তার হাতিয়ার হিসাবে ঘোষণা করে।

এআইসিসিটিইউ প্রতিষ্ঠা সম্মেলন মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। সম্মেলনের ইস্তাহারে বলা হয়েছে বর্তমান ট্রেড ইউনিয়নগুলো 'ছকবাঁধা আন্দোলন' ও 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' বহু ব্যবহৃত পথ অনুসরণ করে একটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে। আলোচনার ভূমিকা বাড়িয়ে দেখা এবং 'প্রস্তুতিবিহীন ও হঠকারী' আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে তারা সংগ্রাম বিমুখতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে।

শেষ বিচারে 'প্রতিকূল পরিস্থিতির' নামে তারা অবশ্যম্ভাবী খারাপ দিক হিসাবে আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে ওকালতি করছেন।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বর্তমান সন্ধিক্ষণটি শ্রমিকশ্রেণির অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের সামনে এক নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসেছে।

তাই নতুন বিপ্লবী কেন্দ্র গঠনই হল আজকের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

এআইসিসিটিইউ গঠনে যারা উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই এক সময় নকশালবাড়ির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শত্রু ও মিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সংগঠন সিপিআই (এমএল)-এর দ্বারা প্রভাবিত।

ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার গঠন (টিইউসিসি)

বামপন্থী ধারায় চিহ্নিত শ্রমিক সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন। ১৯৮০ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে নেতাজির স্বপ্নকে রূপায়িত করার লক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার বা টিইউসিসি গড়ে ওঠে। কিন্তু এর পূর্বেও ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুগামী শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠকগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে এসেছেন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের একমাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ছিল এআইটিইউসি। এই সংগঠনের মাধ্যমেই

স্বাধীনতার পূর্বে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করা হত। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ সালের পরবর্তী সময়েও ফরওয়ার্ড ব্লকের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এআইটিইউসি-র মধ্যেই কাজ করেছিল। বিগত শতকের ৫০ দশকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এআইটিইউসি-র যে রাজ্য সম্মেলন হয়, ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রমিকনেতা সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি, কমরেড অরবিন্দ ঘোষাল অন্যতম সম্পাদক ও কমরেড মলয় ব্রহ্মচারী কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে নবগঠিত সিপিআই(এম) এর অনুগামীরা গঠন করে নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সিআইটিইউ। ১৯৪৯ সালে আরএসপি-র প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন সমূহ মতপার্থক্যের কারণে এআইটিইউসি থেকে বেরিয়ে এসে ইউটিইউসি গঠন করে। ফরওয়ার্ড ব্লকের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও একই কারণে ইউটিইউসি-তে যুক্ত হয়। ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে ফরাওয়ার্ড ব্লকের অনুগামী শ্রমিক সংগঠন সমূহ ইউটিইউসি-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করত। কিন্তু ইউটিইউসি-র মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের ইউনিয়নগুলির কাজ করার অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে দলকে বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে হলে পার্টির পরিচালনায় নিজস্ব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রয়োজন। আদর্শগত কারণে ও পৃথক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব মনে করেছিলেন। নেতাজির স্বপ্নকে রূপায়িত করতে এবং সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে তুলে দিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের আদর্শ অনুযায়ী শ্রমিক সংগঠন থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেন। তৎকালীন নেতৃবৃন্দের মধ্যে ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য, কমরেড অরবিন্দ ঘোষাল, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, অমর চক্রবর্তী ও সরল দেব প্রমুখের চেষ্টায় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন সেণ্টার গঠনের সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে সারা ভারতে ১২টি রাজ্যে এই সংগঠন সক্রিয়।

রাজনৈতিক দলের বিভাজন ও মতপার্থক্যের কারণে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল চল্লিশের দশকের শেষ থেকে। নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ও পার্টি হওয়ার কারণে দেখা দিয়েছিল সর্বক্ষেত্রেই তা নয়, সাংগঠনিক প্রশ্নে, দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণেও এবং ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত স্বার্থেও

নতুন সংগঠন গঠিত হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিভাজন কার্যত শ্রমিক আন্দোলনকেই দুর্বল করেছে।

লেবার প্রগ্রেসিভ ফেডারেশন (এলপিএফ)

দক্ষিণ ভারত বিশেষ করে তামিলনাড়ু ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এলপিএফ সামাজিক সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শকে ভিত্তি করে তামিলনাড়ুর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, জননেতা পণ্ডিত থিরু সি এন আন্নাদুরাই ১৯৪৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 'দ্রাভিদা মুনেত্রা কাজহাগাম' (ডিএমকে) নামে রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকেই এই দলের অনুরাগী শ্রমিকেরা দ্রাভিদিয়ান লেবার প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে অরিগনার আন্নার নেতৃত্বে দল ক্ষমতায় এলে বিভিন্ন কল-কারখানার ইউনিয়নগুলিতে এই দলের অনুগামীরা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নেয়। রাজনৈতিক দলগুলির ট্রেড ইউনিয়নকে বিভাজন সূত্রে বিভিন্ন ইউনিয়ন গড়ে উঠলে 'ডিএমকে' দ্রাভিড়িয়ান লেবার প্রোগ্রেসিভ ইউনিয়নগুলিকে একটা কেন্দ্রীয় সংগঠনের পরিমণ্ডলে আনতে বাধ্য হয়েছিল। দলের অন্যতম নেতা ডা. কালিনগনার করুণানিধি ১৯৭০ সালের ১ মে 'লেবার প্রোগ্রেসিভ ফেডারেশন' (এলপিএফ) গড়ে তোলেন। এই দিনটিতে এলপিএফ-এর পতাকা উত্তোলন করেন থিরু ভি আর নেদুচেরিয়ান এবং চেয়ারম্যান ছিলেন থিরু মানাই নারায়ণস্বামী। এই অনুষ্ঠানেই এলপিএফ-এর উদ্বোধন করেন ডিএমকে নেতা ডা. কে করুণানিধি।

এলপিএফ শুরুর দিন থেকেই দ্রুততার সঙ্গে সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুর মধ্যে ইউনিয়নটির কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে না, তামিলনাড়ুর বাইরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। ভেল, স্টিল, টেলিকম, রেল থেকে শুরু করে টেক্সটাইল, পরিবহণ সমস্ত ক্ষেত্রে 'এলপিএফ' স্বীকৃত ইউনিয়নগুলি গড়ে ওঠে। আজ এলপিএফ একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের মর্যাদা লাভ করেছে। এলপিএফ-এর সাংগঠনিক কাঠামো অর্থাৎ পরিচালন সমিতি— কার্যনির্বাহী কমিটি, রাজ্য কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও সাধারণ কাউন্সিল-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

শ্রমিক সুরক্ষা, কল্যাণ এবং কর্তব্য, দায়িত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার লক্ষে 'এলপিএফ' কাজ করছে।

ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠন

১৯২২ সালের ১৮ জুন ভারতবর্ষের সাংবাদিক আন্দোলনের সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত হল ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র হলেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক হলেন মৃণালকান্তি বসু।

এই সম্মেলনে কলকাতার প্রায় সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। নিয়মকানুন রচনা করার জন্য সাব কমিটি নির্বাচিত হল। তাতে ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র (সভাপতি), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ), পৃথ্বীশচন্দ্র রায় (ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড ও বেঙ্গলি), যোগেশকুমার চট্টোপাধ্যায় (হিতবাদী), শচীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বেঙ্গলি), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (নায়ক), ললিতমোহন গুপ্ত (হিন্দুস্থান), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বসুমতী), মৃণালকান্তি বসু (অমৃতবাজার পত্রিকা), অশ্বিনীকুমার ঘোষ (সার্ভেণ্ট), প্রফুল্লচন্দ্র সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (বঙ্গবাসী), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (বিজলী), মৌলবী ওয়াজেদ আলি (মুসলমান) এবং অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী (লোকমান্য)। অল্প সময়ের নোটিশ দেওয়ায় মফস্বলের সাংবাদিকরা উপস্থিত হতে পারেননি। সভায় স্থির হয়

যে, মফস্‌সলের সাংবাদিকদের পরবর্তী সকল সভায় আহ্বান করা হবে। সাংবাদিক সংঘের প্রথম দফতর স্থাপিত হয় ১২৪/৪ মানিকতলা স্ট্রিট। সাংবাদিক সংঘ তাদের কাজের জন্য মোট ২৪ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সব কর্মসূচির মধ্যে এক দিকে যেমন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার কর্মসূচি ছিল, তেমনই ছিল সাংবাদিকদের আচরণবিধি সম্পর্কে নির্দেশ।

১৯২৩ সালের ২২ জুলাই দ্বিতীয় সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেও কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতি ও মৃণালকান্তি বসু সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৫ সালে সাংবাদিক সংঘের অফিস উঠে আসে ১১এ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে। সাংবাদিক সংঘ তখন নিয়মিত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এই সব প্রশিক্ষণ শিবিরে যারা সে দিন সংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল— বিপিনচন্দ্র পাল, আর্থার মুর, এস ডব্লিউ সি ব্রিজ, এ এইচ ওয়াটসন, ডি ডব্লিউ টাইসন।

বাংলাদেশে সাংবাদিক সংঘ যখন ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়, সেই অনুকরণে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও সাংবাদিক সংগঠন গঠিত হতে শুরু করে। বাংলার পর সাংবাদিক সংঘ গঠিত হয় মহারাষ্ট্রে এবং মাদ্রাজে। অন্য প্রদেশের সাংবাদিক সংগঠনগুলি সর্বদাই মৃণালকান্তি বসুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাংলার সাংবাদিক সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন আফগানিস্তান থেকে বার্মা, বার্মা থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত সব দেশের সাংবাদিক। মৃণালকান্তি বসু এই সময় অনুভব করলেন একটা সর্বভারতীয় সম্মেলন করা প্রয়োজন। সেই মতো ১৯২৯ সালের ১ জানুয়ারি আইজেএ-এর উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের জন্য একটা অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়েছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান প্রমুখ। এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের পদমর্যাদা, চাকরির নিরাপত্তা ও চাকুরির উন্নতি বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে ছিলেন কে নটরাজন (বোম্বে), এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার (মাদ্রাজ), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল (বাংলা), সি ওয়াই চিন্তামণি (এলাহাবাদ)। এ ছাড়া ছিলেন এস এল ব্রেলভি, কে সি রায়, টি প্রকাশন প্রমুখ। মৃণালকান্তি এই কমিটির সম্পাদক হন।

১৯৩৪ সালে আইজেএ-র উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের সূচনা করেন।

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধী ডাণ্ডি যাত্রা শুরু করেন। ভারত সরকার জরুরি আইন জারি করে আইন অমান্য আন্দোলন সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু কলকাতার লিবার্টি ও অ্যাডভান্স পত্রিকা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংবাদ প্রচার করেন। ভারত সরকার দুই পত্রিকার সম্পাদককে গ্রেফতার করেন। অনুরূপ ভাবে বিহারের সার্চলাইট পত্রিকা সরকারি আক্রোশে পড়ে। এই সব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিবাদ সভা শুরু হয়। প্রথম সভা হয় ২৬ এপ্রিল ১৯৩০ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সরকারি দমনপীড়ন বন্ধ হয়। আইজেএ-র উদ্যোগে ১ মে ১৯৩০ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সরকারি অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদপত্র বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সব পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য বোম্বেতে সাংবাদিকদের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকারের প্রেস অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে ২০ এবং ২১ মে সারা ভারতের সব সংবাদপত্র দু'দিন বন্ধ থাকবে। এটাই হল সর্বভারতীয় ভাবে সাংবাদিকদের সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা।

১৯৩১ সালের ৯ অক্টোবর ভারত সরকার সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণে সংবাদপত্রের সমস্ত রকম স্বাধীনতা খর্ব করতে ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাস করে। এই আইনের প্রতিবাদে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে এক সম্মেলন শুরু হয়। ডা. নীলরতন সরকার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সরকার সাংবাদিকদের প্রতিবাদে দমলেন না। তখন ভারতবর্ষ, বার্মার সমস্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা ৩০ সেপ্টেম্বর হরতাল পালন করে। সাংবাদিকদের আন্দোলন চলতে থাকে। রাজ্যে রাজ্যে সাংবাদিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই সময় সর্বভারতীয় ভাবে সাংবাদিক সংঘকে সমগ্র রূপ দিতে ১৯৩৫ সালে এক সম্মেলনে ঠিক হয় ভারতের সমস্ত প্রদেশের সাংবাদিক সংঘগুলি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সংগঠন হিসাবে অনুমোদন গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনই সাংবাদিকদের একমাত্র

সাংবাদিক সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল। মি. চিন্তামণির সভাপতিত্বে ১৯৩৫ সালের এই সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সেই প্রস্তাবে ১২ নম্বর ধারায় যা বলা হয়েছিল, সেটা এখানে তুলে ধরা হল।

This conference urges that Provincial Journalist Associations should be established without delay in the Provinces where they do not exist and is of opinion that all Provincial Association be affiliated to the Indian Journalists' Association, Calcutta, which this conference recognises as the all Indian Organisation of the Journalists.

সর্বভারতীয় ভাবে সাংবাদিকদের সংগঠন তৈরি হওয়ার পর, সারা ভারতবর্ষে রাজ্যে রাজ্যে সাংবাদিক আন্দোলন ক্রমেই সংগঠিত রূপ পেতে শুরু করে। এই সংগঠিত রূপ পরিপূর্ণ অবয়ব পায় ১৯৫০ সালে। এই সময় মৃণালকান্তি বসুর সহযোগী রূপে নেতৃত্বে আসেন এন চলপতি রাও। দিল্লিতে এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে গঠিত হয় ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট, যা পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয় ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট ইউনিয়নে। আজ ভারতবর্ষে সাংবাদিকরা যে অধিকার মর্যাদা এবং বেতন কাঠামোর সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন তার ষোল আনা অবদান মৃণালকান্তি বসুর।

মৃণালকান্তি বসু শুধুমাত্র যে সাংবাদিক আন্দোলনের স্রষ্টা, পুরোধা ও জনক সেটাই নয়। ভারতবর্ষে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নের গর্ভধারিণী জননী হল সংবাদপত্র কর্মচারীদের আন্দোলন। ভারতবর্ষের প্রথম যে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত হয় তার সুতিকাগার এই কলকাতা শহর। কলকাতা শহরেই প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০৫ সালে প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। মৃণালকান্তি বসু কলেজে পড়ার সময় এই প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সহযোগী ছিলেন কিশোরীলাল ঘোষ। ১৯২০ সালের কলকাতায় প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে যে ধর্মঘট হয়, সে ধর্মঘটও ভারতবর্ষে সংগঠিত ধর্মঘট আন্দোলনের প্রেরণা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সে দিন ছিলেন প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯২১ সালের প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি হন নির্মলচন্দ্র চন্দ। সেই প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে পরবর্তী কালে সভাপতি হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। পরবর্তী কালে এর সঙ্গে যুক্ত হন মুকুন্দলাল সরকার। ১৯২০ সালের ৩১ অক্টোবর বোম্বাইতে (সভাপতি

লালা লাজপত রায়) যে সর্বভারতীয় ভাবে নিখিল ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় (এআইটিইউসি) তার সূচনা হয়েছিল ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের ফলে। এক কথায় ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জননী হল সংবাদপত্র কর্মচারী ও সাংবাদিকদের সংগঠন। আর এই সংগঠনের জনক হলেন মৃণালকান্তি বসু।

ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় বন্‌ধ, হরতাল ও ধর্মঘটের বিবরণ

প্রতিটি ধর্মঘটেই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ও কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

১৯৪৮ সালের ২ এপ্রিল ফেডারেশন অব সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন।

১৯৫৩ সালের ১৫ জুলাই শ্রমিক হত্যাকাণ্ড ও ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে সাধারণ ধর্মঘট।

১৯৫৩ সালের ৩১ জুলাই ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির ডাকে ধর্মঘট।

১৯৫৮ সালে ডিভিসি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৪২ দিন ধর্মঘট।

১৯৫৯ সালের ৩১ অগস্ট খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ৮০ জন মানুষের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১ সেপ্টেম্বর ছাত্র ধর্মঘট এবং ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী হরতাল পালিত হয়।

১৯৬০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এক দিনের কর্মবিরতি পালন করেন।

ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশনস কমিটির আহ্বানে ১৪ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের প্রতি চরম অবিচারের নীতি ও সরকারি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি অস্বীকার করার প্রতিবাদে ১৯৬০ সালের ১১ জুলাই মধ্যরাত থেকে ১৬ জুলাই অনির্দিষ্টকালের জন্য লাগাতার ধর্মঘটে সামিল হয় কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা।

১৯৬৪ সালে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ৬ মাস ব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট।

১৯৬৬ সালের ১২ অক্টোবর ডিভিসি-র তাপবিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের এক দিনের ধর্মঘট।

১৯৬৬ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের স্টেশনারি বিভাগের কর্মচারীরা দু'দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৬৭ সালের ২২-২৩ নভেম্বর কংগ্রেসি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের এবং নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ৪৮ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ।

১৯৬৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আয়কর বিভাগের কর্মচারীরা তাদের দাবি নিয়ে এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৬৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এক দিনের ধর্মঘটে সামিল হল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা।

১৯৬৯ সালের ৪—১১ অগস্ট, ৮ দিন পশ্চিমবঙ্গে চটকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন।

১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে বাংলা বন্‌ধ।

১৯৭০ সালের ১২ অগস্ট থেকে দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় শিল্প বাহিনী মোতায়েন ট্রেড ইউনিয়নের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘট শুরু।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর চটকল শ্রমিকরা পুনরায় ধর্মঘট করেন। শিল্পভিত্তিক চুক্তি হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর।

১৯৭১ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি জননেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার প্রতিবাদে ২১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে বাংলা বন্‌ধ।

১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে এক দিন বাংলা বন্‌ধ।

১৯৭৩ সালের ১৭ নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধি, রেশনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তায় সরবরাহ করা ইত্যাদি দাবিতে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ৭ মে লে-অফ, লক-আউট, বিদ্যুৎ সঙ্কট ইত্যাদির প্রতিবাদে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের ৮ মে এনসিআরএস-এর নেতৃত্বে ২০ লক্ষ রেল-শ্রমিক কর্মচারী ২০ দিনের সারা ভারত ধর্মঘট শুরু করে। পশ্চিমবাংলার ধর্মঘটী রেল শ্রমিক কর্মচারীদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস নেমে আসে।

১৯৭৪ সালের ১৫ মে রেল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট।

১৯৭৫ সালের ২০ জুন সস্তায় খাদ্য সরবরাহ, ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, কর্মচ্যুত শ্রমিকদের কাজে পুনর্বহাল ইত্যাদি দাবি নিয়ে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৭৯ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ৫০ দিন ধর্মঘট করেন বাংলার চটকল শ্রমিকরা।

১৯৮০ সালের ১৭ মে অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার দাবিতে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট নিষিদ্ধকারী অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদান সহ ১৮ দফা দাবিতে বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়।

১৯৮২ সালে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘট হয়েছিল।

১৯৮৩ সালের ৩ মে দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এক দিনের ধর্মঘট।

১৯৮৪ সালের ২৫ অগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের রামা রাও সরকার ও জম্মু-কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লা সরকারের পতন ঘটানোর প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮৪ সালে চটকল শ্রমিকরা ৮৪ দিন লাগাতার ধর্মঘট করেন।

১৯৮৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক-তার বিভাগের কর্মচারীরা এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৮৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮৫ সালের ৬ জুন সারা ভারতের রেলওয়ে মেল সার্ভিস ও মেইল মোটর শ্রমিকরা এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৮৫ সালের ২৯ অগস্ট বামপন্থীদের ডাকে রাজ্যের মানুষের ৪ দফা দাবি নিয়ে গ্রামবাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৮৬ সালে চটকল শ্রমিক ও পাটচাষিদের যৌথ উদ্যোগে এক দিনের ধর্মঘট।

১৯৮৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন।

১৯৮৮ সালের ১৫ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ভারত বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের ১৭ অগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের ৬ ডিসেম্বর দেশজুড়ে সংবাদপত্র কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন।

১৯৮৯ সালের ৩০ অগস্ট বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে ভারত বন্‌ধ।

১৯৯১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তামিলনাড়ু সরকারের পতন ঘটানোর প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ১৪ জুলাই বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ-এর চাপে আর্থিক সংস্কার নীতি ঘোষণার প্রতিবাদে ভারত বন্‌ধ হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়।

১৯৯২ সালের ১৬ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের উদার অর্থনীতির প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।

১৯৯২ সালের ৩০ এপ্রিল নয়া উদারনীতির প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক, বিমা কর্মচারীরা সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯২ সালের ৮ জুলাই সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য দাবিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা সারা ভারত ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯২ সালের ৮ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনৈতিক দলের আহ্বানে ভারত বন্‌ধ। পশ্চিমবঙ্গে ৭ ডিসেম্বর ধর্মঘট।

১৯৯৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ২০ দফা দাবিতে ৫৬টি কেন্দ্রীয় গণ সংগঠনের ডাকে ভারত বন্‌ধ পালিত হয়।

১৯৯৩ সালের ৩—৯ ডিসেম্বর দেশজুড়ে ডাককর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৪ সালের ৮ এপ্রিল ব্যাঙ্ক, বিমা ক্ষেত্রের কর্মীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২৩ লক্ষ কর্মচারী ধর্মঘট করেছিলেন।

১৯৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতিবাদে ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক নীতি, শিল্প নীতি, গ্যাট চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের ৫৬টি গণসংগঠনের জাতীয় মঞ্চের আহ্বানে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয়।

১৯৯৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বিমা কর্মচারীরা বিমা শিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৫ সালের ১৯—২৩ জুন দেশব্যাপী টেলিকম কর্মীরা ধর্মঘটে শামিল।

১৯৯৫ সালের ২১ অগস্ট কয়লা শিল্প বেসরকারিকরণের উদ্যোগের প্রতিবাদে কয়লা শিল্পের শ্রমিকরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৫ সালের ৩১ অগস্ট বিমা শিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিমা বিমা শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৫ সালের ২৬—২৭ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা দেশব্যাপী এক দিনের ধর্মঘট করেন।

১৯৯৫ সালের ৩০ অক্টোবর কয়লাখনি বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে কয়লাখনি শ্রমিকরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর কয়লাখনি শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৫ সালের ২৬—২৭ ডিসেম্বর বিমা শিল্প রক্ষার দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা দু'দিন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৬ সালের ২ জানুয়ারি বিমা শিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিমা শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৬ সালের ১৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতিবাদে ৮০ লক্ষ মৎস্যজীবী দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী পেনশন নীতির প্রতিবাদে সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট হয়।

১৯৯৬ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ৭ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা তাদের দাবিগুলি নিয়ে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৯৬ সালের ৯ ডিসেম্বর বিমা শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৭ সালের ২ এপ্রিল কয়লাশিল্পের শ্রমিকরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারিকরণের উদ্যোগের প্রতিবাদে সারা ভারতব্যাপী ধর্মঘট হয়।

১৯৯৭ সালের ১১ নভেম্বর সার শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে এক দিনের ধর্মঘট করেন।

১৯৯৮ সালের ৩ জুলাই মূল্যবৃদ্ধি, জনস্বার্থবিরোধী রেল ও সাধারণ বাজেটের প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়।

১৯৯৮ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্বায়ন ও উদার অর্থনীতির প্রতিবাদে সারা দেশের ৫৬টি গণ সংগঠনের আহ্বানে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত।

১৯৯৯ সালের ২৯ অক্টোবর বিমা শিল্পের বেসরকারিকরণের উদ্যোগের প্রতিবাদে বিমা কর্মীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট করেন।

২০০০ সালের ১৮—২২ জানুয়ারি ডক ও পোর্ট শ্রমিক-কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে দেশব্যাপী রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন।

২০০০ সালের ১১ মে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় মঞ্চের ডাকে বিজেপি জোট সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট।

২০০০ সালের ২৮ জুন টেলিকম শিল্পের সাড়ে তিন লক্ষ কর্মচারী ধর্মঘট করেন।

২০০০ সালের ২৪-২৫ অগস্ট দু' দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় টেলিকম বিভাগের কর্মীরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ৫—৮ নভেম্বর ডাক-তার কর্মীরা ৪ দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ১২ নভেম্বর ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের উদ্যোগের প্রতিবাদে বিদ্যুৎকর্মীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক কর্মীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ২৫ জুলাই সারা ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

২০০০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা কলকাতার তারাতলার মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলি নিয়ে ধর্মঘট পালন করেন।

২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির প্রতিবাদে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেন।

২০০১ সালের ২৫ জুলাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করেন।

২০০২ সালের ১৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ডাউনসাইজিং ও ভিআরএস চালু করার প্রতিবাদে সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এক দিনের ধর্মঘটে শামিল হন।

২০০২ সালের ১—১১ অগস্ট ১১ দিন কয়লা শিল্পের শ্রমিকরা কয়লাশিল্প বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং অন্যান্য দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন।

২০০৩ সালের ২৫—২৭ মার্চ তিন দিন পেট্রোলিয়াম শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

২০০৩ সালের ২১ মে বামপন্থী দলগুলির আহ্বানে দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়।

২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর পেট্রোলিয়াম শিল্পের কর্মীরা এক দিনের ধর্মঘট।

২০০৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটের অধিকার রক্ষা সহ ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি অর্জনের জন্য দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল।

২০০৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

২০০৬ নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৭ মার্চ বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়।

২০০৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর গণসংগঠনগুলির জাতীয় মঞ্চের ডাকে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন সারা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

২০০৭ সালের ২৯ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের জিএআই এবং ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস-এর কর্মচারীরা সংস্থার স্থায়ী পদগুলির অবলুপ্তির প্রতিবাদে এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

২০০৭ সালের ৮ অগস্ট সারা দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্র ও পেশার সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের সামাজিক সুরক্ষামূলক দাবিগুলি সহ অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে সারা দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। ওই ধর্মঘটে সারা দেশের কয়েক লক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

২০০৭ সালের ৩০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সহ ১২ দফা দাবি নিয়ে দেশব্যাপী এক দিনের ধর্মঘট পালন করেন।

২০০৮ সালের ২০ অগস্ট দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর থেকে চটশিল্পের ২০টি ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধর্মঘটে শামিল হয়।

২০১০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়।

২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে আইএনটিইউসি সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়।

২০১৩ সালের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও কর্মচারী ফেডারেশন সমূহের আহ্বানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা ১০ দফা দাবিতে রাজ্যে অভূতপূর্ব সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল রাজ্যের পৌরসভাগুলির নির্বাচনে অবাধ সন্ত্রাস ও কারচুপির প্রতিবাদে রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের সাধারণ ধর্মঘট।

২০১৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও কর্মচারী ফেডারেশন সমূহের আহ্বানে এই ধর্মঘট সমস্ত রকম সন্ত্রাস ও প্ররোচনা উপেক্ষা করে ব্যাপক সফল হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সাধারণ ধর্মঘট সর্বাত্মক বন্‌ধের রূপ গ্রহণ করেছিল। অতীতের বিশ্বায়ন-বিরোধী যে কোনও ধর্মঘটের তুলনায় এই ধর্মঘট সর্বাত্মক হয়েছিল।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের তালিকা

	তারিখ	আহ্বায়ক	আন্দোলন
১	১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি	গণছুটি
২	১৬ মে, ১৯৬৮	”	ধর্মঘট
৩	২৫ জুন, ১৯৭০	”	ধর্মঘট
৪	২৪ জুলাই, ১৯৭০		জয়েন্ট অ্যাণ্ড কুইট ধর্মঘট
৫	২৬, ২৭, ২৭ অগস্ট ১৯৭০		ধর্মঘট
৬	১৩ অক্টোবর, ১৯৭১	বামপন্থী দলগুলি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি	বাংলা বন্ধ (বরখাস্ত নেতৃবৃন্দের পুনর্বহাল দাবিতে
৭	৯ এপ্রিল, ১৯৭৪	সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন	ধর্মঘট
৮	৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪	”	
৯	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬	”	
১০	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮	”	
১১	১০ জানুয়ারি, ২০০১	”	

এ ছাড়া বিগত শতাব্দীর ৮০-এর দশক থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা সর্বভারতীয় ধর্মঘটগুলিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অংশগ্রহণ করেছে।